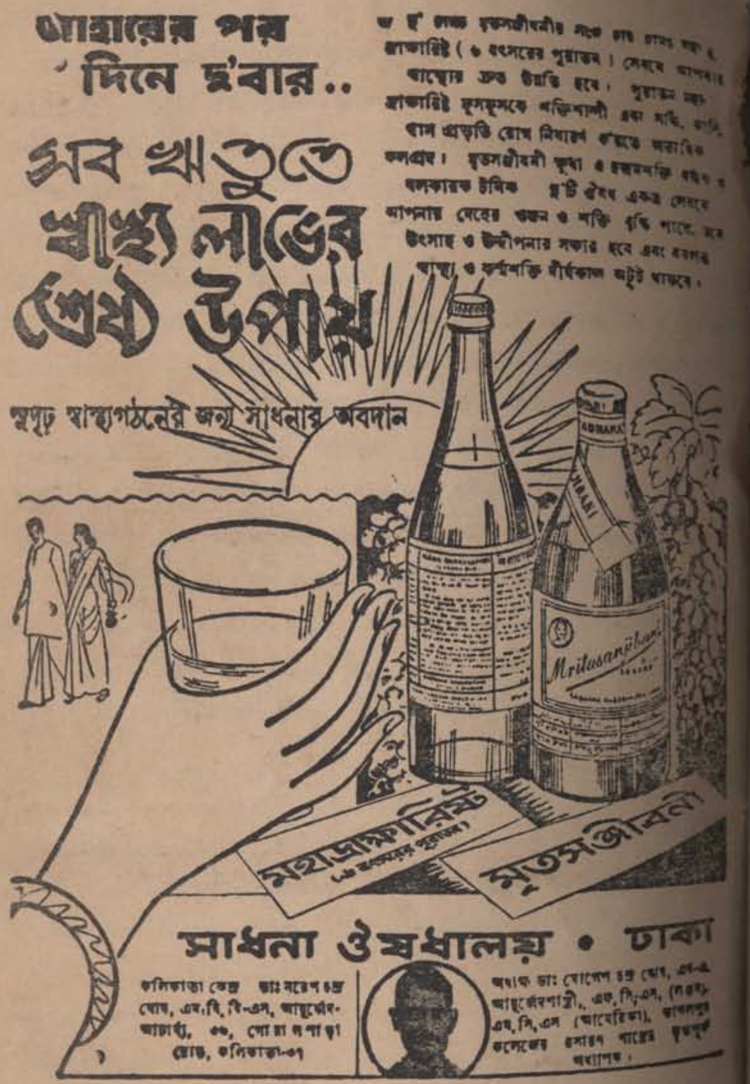
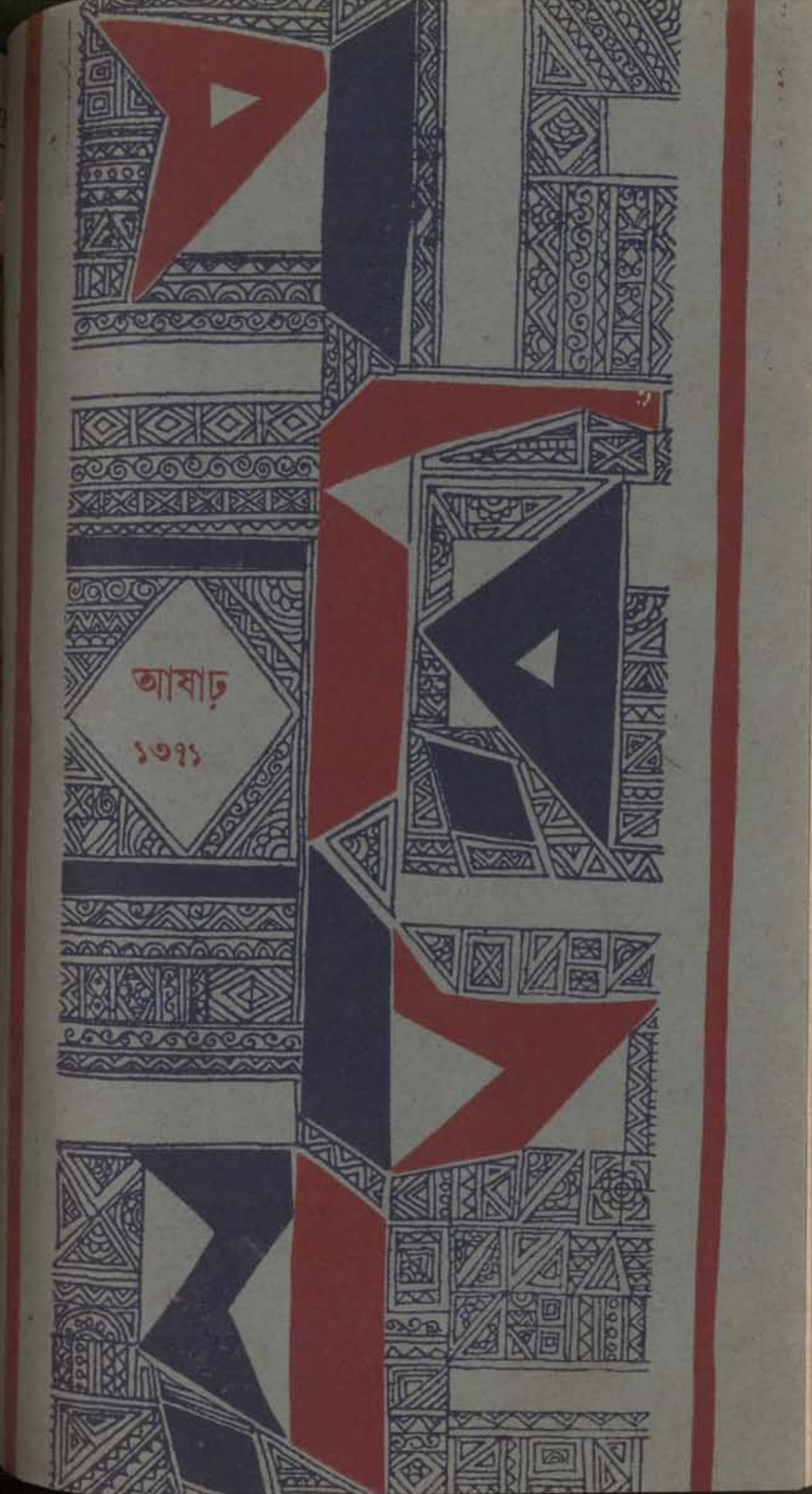

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা


আষাঢ়
১৩৭১

আপনি পরিচয়-এর গ্রাহক হয়েছেন?

আগামী শ্রাবণে পরিচয় ৩৪ বছরে পা দেবে। এই উপলক্ষে নতুন করে পরিচয়-কে সর্বাঙ্গসুন্দর করার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দু বছর আগে পরিচয়-এর যে উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল—জাতীয় জরুরী অবস্থার দরুণ তা ব্যাহত হয়। এখন আমরা সেই অসমাপ্ত কাজ সুসম্পন্ন করতে পারব বলে আশা করি।

বাংলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ্‌দের নিয়ে পরিচয়-এর একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। শ্রাবণ মাসে এই নবগঠিত সম্পাদকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করা হবে। তাঁদের যোগ্যতর পরিচালনায় পরিচয়-এর যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

নতুন বছরে আমরা আশা করছি পরিচয়-এর পৃষ্ঠা সংখ্যাও আরও কিছু বাড়াতে পারব। কয়েকটি নতুন বিভাগও শুরু করা যাবে।

এই পরিকল্পনা ব্যয়সাপেক্ষ। পরিচয়-এর প্রধান ভরসা তার পাঠকগোষ্ঠী। পরিচয় গত ৩৩ বছর ধরে বাংলা দেশের সাহিত্য-পত্রিকার শীর্ষ স্থান অধিকার করে থাকতে পেরেছে—এ কৃতিত্বের দায়ভাগ পরিচালকবর্গ অপেক্ষা পাঠক-গোষ্ঠীর কম নয়। দুর্যোগের দিনে তাঁরা পরিচয়-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, কর্তব্যচ্যুতি ঘটলে তিরস্কার করেছেন, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে পরিচয়-এর অস্তিত্ব রক্ষা করা দুরূহ হত। আজ তাই আমরা তাঁদেরই শরণ নিচ্ছি?

আপনি যদি পরিচয়-এর গ্রাহক না হয়ে থাকেন তো অবিলম্বে পরিচয়-এর গ্রাহক হোন। আপনার বন্ধুকে গ্রাহক করে দিন। কে গ্রাহক হতে পারে তার ঠিকানা আমাদের আফিসে পাঠান, আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করব। পরিচয়-এর গ্রাহক-সংগ্রহ অভিযানে সাহায্য করুন।

পরিচয়-এর গ্রাহক চাঁদা: বার্ষিক দশ টাকা, ষাণ্মাসিক সাড়ে পাঁচ টাকা। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।

পরিচয়

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা

অন্যান্য বছরের মতো এবারও পরিচয়-এর শ্রাবণ সংখ্যা সমালোচনা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে।

এবারকার সমালোচনা সংখ্যায় লিখবেন : সুশোভন সরকার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, হিরণকুমার সান্যাল, গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, বিনয় ঘোষ, প্রদ্যোৎ গুহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রণজিৎ দাশগুপ্ত, অমল দাশগুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা সরকার, দিলীপ বসু, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব গুপ্ত, তরুণ সান্যাল, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, শঙ্কর চক্রবর্তী, গৌতম সান্যাল,চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সুনীল সেন, জ্যোতির্ময় গুপ্ত, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ কর, অচিন্ত্যেশ ঘোষ, সুব্রতেশ ঘোষ, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

দাম : দেড় টাকা

গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত
মূল্য দিতে হবে না
এজেন্টরা অগ্রিম চাহিদা জানান

পরিচয়

বর্ষ ৩৩। সংখ্যা ১২
আষাঢ়, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

শ্রীগোপাল প্রকাশনীর সদ্যপ্রকাশিত বই :—

মহাস্থবির

দীর্ঘকাল পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের একখানি বই

শিউলি ৩·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের রসমধুর উপন্যাস

বধূমল্লার ৪·৫০

শ্রীবাসব-এর চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

বাঁধন ছেঁড়া দাগ ৫·০০

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

জীবন-সৈকতে ২·৫০

প্রাপ্তিস্থান : ডি. এম লাইব্রেরী ॥ ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

বিশ্বপরিস্থিতি তথা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, সম্পর্কে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র মাসিকপত্র

আন্তর্জাতিক

প্রধান সম্পাদক : **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়**

প্রকাশক : **পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ**

প্রতি সংখ্যা—পঞ্চাশ নয়া পয়সা ; বার্ষিক চাঁদা—ছয় টাকা

ষান্মাসক চাঁদা—তিন টাকা

১৪৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১৩

২৪-৩৯৩০

ভারতের নৃত্যকলা । গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

ভারতের নৃত্যকলা প্রসঙ্গে প্রথিতযশা শিল্পীর গবেষণা-মূলক এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রয়াস। মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাম : বারো টাকা



● কয়েকটি মতামত ●

নৃত্যকলা প্রসঙ্গে এমন সুলিখিত তথ্যমূলক গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় বিরল। এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য লেখিকাকে অভিনন্দন জানাই। **—লক্ষ্মীশংকর।**

দীর্ঘ প্রত্যাশিত এই অনন্য গ্রন্থে আলোচনার ব্যাপকতা, তত্ত্ব ও তথ্য সমাবেশের প্রামাণ্যতা লেখিকার গভীর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

—সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চসহস্রবর্ষব্যাপী ক্রমবিকশিত নৃত্যকলার ইতিহাস। আঙ্গিক ও শাশ্বত স্বরূপসত্তা এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। **—কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি।**

নৃত্যকলার ইতিহাস, ব্যাকরণ, দর্শন ও বিভিন্ন আঙ্গিকের আলোচনাসমৃদ্ধ এই গ্রন্থের উৎকর্ষে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। **—বালকৃষ্ণ মেনন।**

ভারতের নৃত্যকলা, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বহুবিচিত্র তথ্যের সমাবেশে চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যে আমাকে মুগ্ধ করেছে।

—অনাদিকুমার দস্তিদার।

ভারতীয় নৃত্যের কুশলী শিল্পী এই গ্রন্থে শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সব তথ্যই সুন্দরভাবে বহু ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক নৃত্যশিক্ষার্থীকে আমি এই গ্রন্থ পড়তে বলি। **—গুরু নবীয়া সিং।**

নবপত্র প্রকাশন। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-৯

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জওয়াহরলালজী নেহরু

বুদ্ধ পূর্ণিমার রাত ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জওয়াহরলালজী নেহরুর হৃদ্‌যন্ত্র জানিয়ে দিয়েছিল যে তার মেয়াদ বোধ হয় ফুরিয়ে আসছে। অনেক দিনের অনেক ধাক্কা সাম্‌লে-আসা এই যন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। এই তো ণতি সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিমুখে বলেছিলেন যে তাঁর জীবন চট্ করে শেষ হতে যাচ্ছে না! যখন চার মাস আগে ভুবনেশ্বরে জওয়াহরলাল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন থেকে সারা দেশ আশা আর আশঙ্কা নিয়ে উৎকণ্ঠিত ছিল। অবাধ্য নিয়তি সে-অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে।

আগের রাতে কাকে যেন বলেছিলেন যে সরকারী 'ফাইল্' দেখার কাজ তিনি শেষ করে রাখলেন। ভোরে উঠে বুকের যন্ত্রণা আর সর্বদেহে অস্বস্তিকে অগ্রাহ্য করে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরেছিলেন, দৈনন্দিন দাড়ি কামানো থেকে বিরত হন নি। বয়সের বোঝা আর অপরিসীম কাজের চাপ কোনও দিন তাঁর আচারে ব্যবহারে আকৃতিতে অযত্ন আর শৈথিল্যের ছাপ রাখতে পারে নি। জীবনের শেষদিনেও স্বভাবের এই রীতি থেকে তাই তিনি বিচ্যুত হন নি। চিরদিনই তিনি চেয়েছিলেন যে মৃত্যু যেন আচমকা আসে। রোগ-শয্যায় অসহায় হয়ে শুয়ে থাকার কথা ভাবলে তিনি শিউরে উঠতেন—কিন্তু যমরাজের তলব তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করবে, এ-জিনিস তিনি ান নি। মরণকে নিজের দুয়ারে দেখেও তাই দিনের কাজের জন্য তৈরি হতে তিনি ভোলেন নি। জওয়াহরলালের শিল্পীমন নিজের সম্বন্ধে গালভরা বিশেষণ শুনলে যে কুণ্ঠিত হত তা জানি। 'কর্মবীর' তাঁকে বলা নিশ্চয়ই যায় কিন্তু আজ না হয় ঐ ধরনের বাক্য ব্যবহার না-ই করা গেল। শুধু বলা

যাক যে কাজ ছিল যার প্রাণ, কাজ ছিল যার একমাত্র উপাসনা, কাজ ছিল যার মর্মের অনুভূতির নিরন্তর তুষ্টিহীন প্রকাশ, কাজে বাধা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চৈতন্য লুপ্ত হল, রোদে ধোওয়া আলোয় ফুলের হাসিও তার ঘুম ভাঙাতে পারল না।

সত্যই ইন্দ্রপাত হয়ে গেল আমাদের মধ্যে—কিন্তু যার তিরোধানে সারা দেশ আজ এত ব্যথিত, তিনি দেবরাজ ছিলেন না। দেবোচিত বহু গুণের অধিকারী হয়েও তিনি ছিলেন নিছক মানুষ, অশান্ত, অস্থির, সদাজিজ্ঞাসু, প্রখর, প্রকৃত মানুষ। সর্বরিপুদমনের অতিমানুষিকতা কোনও দিন তাঁকে প্রলুব্ধ করে নি—জীবনের শেষ অধ্যায়ে দেখা গেছে সৌম্য, সংযত আত্ম-সংহতির প্রয়াসে তিনি বহুলাংশে সফল হয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছা করেছে দেখতে সেই পূর্বাভ্যস্ত রূপ, যখন তাঁর মনের বিচিত্র ইন্দ্রধনু থেকে ক্ষিপ্র, তীব্র শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে, লক্ষ্যভেদ না ঘটলেও বায়ুমণ্ডল বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে, "শুধু দিনযাপনের গ্লানি" থেকে নিস্তারের পথ যেন দেখা গেছে, ক্লেদ আর ক্ষুদ্রতা যে রাজনীতিপথে অকাট্য নয় তা বোঝা গেছে।

অনধিকারী হয়েও বলতে ইচ্ছা করে যে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব প্রশান্তির আস্বাদ পাওয়া যেত, কোন্ জাদুবলে অশান্তির অন্তর্নিহিত সুমহান্ শান্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মনে হত। জওয়াহরলালজীর সান্নিধ্যে অনুভূতি আসত ভিন্ন প্রকৃতির। গান্ধীজীর হাস্য-মণ্ডিত মুখ আর অতি স্বচ্ছ আলাপ তাঁর মানবিকতার প্রোজ্জ্বল সাক্ষ্য হলেও মনে হত যে তিনি যেন অন্য গ্রহবাসী, যে জগতে আমাদের বিচরণ তা থেকে অন্যত্র তাঁর অধিষ্ঠান। এই দূরত্ববোধ জওয়াহরলালের কাছে বসলে মনে জায়গা পেত না। সন্দেহ নেই যে তাঁর অনন্য মহত্ত্ব সান্নিধ্যে এসে অনুভব করতেই হত। কিন্তু একান্ত একাকী এই ব্যক্তিকে একেবারে আত্মীয় মনে করতে বিলম্ব ঘটত না, প্রায় সমান স্তরে কথা বলার ধৃষ্টতা সংগ্রহ করতে কোনো ক্লেশ বা অস্বস্তি বোধ হত না। জন্মে, শিক্ষাদীক্ষায়, জীবনপদ্ধতিতে অভিজাত হয়েও জওয়াহরলাল এদেশে সর্বজনের প্রিয়বান্ধব যে হতে পেরেছিলেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর চরিত্রে, তাঁর অনায়াস অমায়িকতায়, নির্বিশেষে অপরের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা পোষণের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতিতে।

ভারতবর্ষের অধুনাতন ইতিহাসে চারিত্র্যের এই আবির্ভাবকে সমুজ্জ্বল

ঘটনা বললে অত্যুক্তি হবে না। একে একটু বিস্ময়করও বলা যায়, কারণ প্রথম জীবনে জওয়াহরলাল প্রতিভা কিম্বা অসামান্যতার তেমন কোনো আভাস দেন নি। ধনী বংশে জন্ম, বিলাসে লালন, বিদেশে শিক্ষা,—উপসংহারে অর্থোপার্জন ও সাংসারিক সাফল্যে পর্যবসন অসঙ্গত ছিল না। পরাধীন দেশে জন্মেও রাজনীতি ব্যাপারে তরুণ বয়সে তাঁর অনীহার অন্ত ছিল না। মদনলাল ধিংড়া লণ্ডন শহরে প্রকাশ্য সভায় ভারত শাসনে কুখ্যাত ইংরেজ রাজপুরুষকে হত্যা করে স্বাধীনতার জয়গান করতে চেয়েছিলেন, তখন জওয়াহরলাল তাঁর সাহসে মুগ্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর আবেগ গভীরভাবে উদ্রিক্ত হয় নি। বিপিনচন্দ্র পালের মতো ব্যক্তিকে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে অতি উচ্চ স্বরে দেশের দুর্দশার কথা বলতে শুনে তাঁর মার্জিত রুচিতেই আঘাত লাগে, বিখ্যাত দেশনেতার বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়েছিল। দেশে ফিরে আদালতে 'প্র্যাকৃটিস্' করতে যাওয়া, মাঝে মাঝে ক্লাবে গিয়ে গল্পগুজব করা। মোটের উপর সৎভাবে সমাজের উপরতলার জীবন নির্বাহ করা—এবং বাইরে খুব বেশি চিন্তা তখন তিনি করতে চান নি। কিন্তু আগ্নেয়গিরির মতো তাঁর মনের গভীরে একটা মস্ত বড় আলোড়ন নিশ্চয়ই তৈরি হচ্ছিল। আর যখন দেশের জীবনে গান্ধীজীর আবির্ভাব হল, মোতিলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি যখন বিলাসব্যসন ও উগ্র রাজনীতির প্রতি বীতরাগ ভাব ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে নামলেন, তখন যেন জওয়াহরলাল প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করলেন। নতুন পশ্চাৎপট নিয়ে ভারতবর্ষের যে নতুন পরিবেশ আর নূতন জীবন সৃষ্টি তখন হতে চলেছিল, সেই জীবনে যেন তাঁর দ্বিতীয় জন্ম ঘটল।

জওয়াহরলাল নিজে বলে গেছেন তাঁর জীবনে তিনজন ব্যক্তির প্রভাব কত বেশি ছিল। পিতা মোতিলাল ছিলেন তেজস্বী, অপরিসীম পুত্রস্নেহ সত্ত্বেও পুত্রের সঙ্গে মতবিরোধ তাঁর বারবার ঘটেছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উভয়ে ছিলেন যেন উভয়ের সচিব এবং সখা। গান্ধীজীর ইন্দ্রজালে জওয়াহরলাল জড়িয়ে পড়েছিলেন। স্বভাবের প্রচণ্ড পার্থক্য এবং বহু বিষয়ে বিচারভেদ তাঁদের মধ্যে সহজে ধরা পড়ে, কিন্তু গান্ধীজীর তুলনাহীনতার মায়া কাটিয়ে ওঠা জওয়াহরলালের সাধ্য কিম্বা সাধ কখনও হয় নি। জওয়াহরলালের মানসিকতার একটা বৃহৎ অংশ ছিল শিল্পী—তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্ত ছিল না, মনের গঠনে ও সংবেদনশীলতায় তাঁদের মধ্যে

মিল ছিল প্রভূত। কিন্তু জওয়াহরলাল ছিলেন গান্ধীজীর ছকে না হলেও গান্ধীজীর হাতে গড়া। বোধ হয় বলা যায় যে স্বদেশের চেয়ে বিদেশের সঙ্গে যোগ যার কিশোরকাল থেকে ছিল সমধিক, সে যেন চিরন্তন ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীকরূপে আবিষ্কার করল গান্ধীজীকে, আর তার পর থেকে মতভেদ আর আশাভঙ্গ-জনিত বিস্ময় ও বিরক্তি সত্ত্বেও তাঁকেই অবিচল আলোকবর্তিকা বলে গ্রহণ করল। এই আবিষ্কার ও দীক্ষাকেই বুঝি জওয়াহরলালের জীবনের কেন্দ্রবস্তু বলা চলে।

আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন নিজ বাসভূমে পরবাসী অনুভূতির কথা—"কোথাও যেন আমার ঘর নেই, সর্বত্রই আমি খাপছাড়া।" ১৯২০-২১ সালে বাস্তবিকই দেখা গেছল গান্ধীজীর জাদুকরী। জওয়াহরলালের মধ্যে যে মহিমা সুপ্ত হয়েছিল, কোথা থেকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে তিনি জাগিয়ে তুললেন। সমসাময়িক ভারত ইতিহাসে এ হল একটা বড় দরের ঘটনা।

তখন থেকে জওয়াহরলালের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারই শেষ দেখলাম সেদিন। আমাদের ইতিহাসের একটা গর্ব করার মতো অধ্যায় যেন তাঁর নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে গেল।

গান্ধীর সবচেয়ে একনিষ্ঠ ভক্ত হয়েও জওয়াহরলাল কখনও বহু গান্ধী-শিষ্যের মতো কেবল গান্ধীবাক্যের প্রতিবিধান করতে চান্ নি, পারেন নি। তাঁর এমন ক্ষমতা বা ইচ্ছাও কখনও হয় নি যে গান্ধীর পথ পরিহার করে নিজের বুদ্ধি ও বিচার যা বলে তদনুযায়ী চলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধী যে সিদ্ধান্ত করেছেন তারই সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য না ঘটিয়ে তিনি পারেন নি—গান্ধীও ঐ সামঞ্জস্য সাধনে সহায়তা করে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও কর্মপন্থার জালে জওয়াহরলালকে বহুবার বেঁধেছেন। কিন্তু দেশের মানুষের অবস্থা আর দুনিয়া জুড়ে সমাজ বিবর্তনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা বুঝে ভারতবর্ষের বাস্তব ক্ষেত্রে নতুন পথের প্রবর্তন সম্বন্ধে জওয়াহরলালের অবদান কখনও ভুলতে পারা যাবে না। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধী লিখেছিলেন তাঁকে : "তুমি যেমন ভাবো, তেমনই ধনী আর শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে আন্দোলন আমাদের করতে হবে—কিন্তু তার সময় এখনও আসে নি।" গান্ধীজীর হিসাবে তার সময় কখনও এল না, আর জওয়াহরলালের হিসাবে সময় এল আর চলে গেল, তার সদ্ব্যবহার সম্ভব হল না। ফল অবশ্য এক,

কিন্তু জওয়াহরলালের চিন্তা আর কর্মের সঙ্গে আমাদের এই মান্ধাতাগন্ধী দেশের এগিয়ে চলার যে সম্পর্ক রয়েছে, তাকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই।

অনলস আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে জওয়াহরলাল গতিশীল জীবনের কথা সর্বদা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মনে পড়ে যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা—যে-ঐতরেয় শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত ঋষিপুত্র মহীদাসের রচনা বলে খ্যাত, যে-ঐতরেয় গ্রন্থ পাঠ বিনা বেদজ্ঞান নাকি সম্ভব নয়, যার শিক্ষা এসেছিল স্বয়ং মাতা বসুন্ধরার কাছ থেকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে, রাজপুত্র রোহিত পথশ্রান্ত হয়ে ঘরে চলেছেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁকে বার বার পাঁচবার নানা ভাবে বললেন, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—চরৈবেতি, চরৈবেতি। "চলাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়ে নি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।"

এগিয়ে চলবার এর চেয়ে প্রদীপ্ত বাণী আর কোথাও আছে কি ? একেই মূলমন্ত্র করেছিলেন জওয়াহরলাল—জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করে এগিয়ে চলো, কুসংস্কার বর্জন করে এগিয়ে চলো, স্বার্থসন্ধতাকে পরিহার করে এগিয়ে চলো, যাতে সর্বজন সুখী হয় সেই প্রচেষ্টার পথে এগিয়ে চলো। এ-কথাই তাঁর জীবন দিয়ে জওয়াহরলাল বলে গেছেন। তাঁর অশান্ত, অশ্রান্ত জীবন-কথার এই তো মর্মবাণী।

জওয়াহরলালের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি কথা না বললে চলবে না। বিপ্লবী বলতে প্রকৃত প্রস্তাবে যা বোঝায়, তা তিনি ছিলেন না—এজন্য কোনো কোনো পরিস্থিতিতে তিনি বিপ্লবীদের চক্ষুশূল হয়েছেন আর তা অহেতুকও ছিল না। কিন্তু কেমন করে ভোলা যায় যে তাঁর ধারণায় অসঙ্গতি ও দুর্বলতা থাকলেও ১৯২৭ সাল থেকে এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন সর্বোপরি তিনি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভুলভ্রান্তি তাঁর বহু ঘটেছে, কিন্তু মনের প্রকৃত প্রসার আর হৃদয়ের দরদ নিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। করাচী কংগ্রেসে (১৯৩২) মৌলিক অধিকারের যে সনন্দ তিনি পেশ করেন, তাতে ফাঁক এবং ফাঁকি ছিল যথেষ্ট, কিন্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তার তদানীন্তন মূল্য একেবারেই

অল্প ছিল না। "Whither India ?" আখ্যা দিয়ে যে প্রবন্ধগুলি তিনি প্রকাশ করেন, এদেশে সোশালিজমের প্রসারে তার অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না করলে অপরাধ হবে। লক্ষ্নৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) সভাপতিরূপে তাঁর অভিভাষণে সোশালিজম্ এবং সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য যে আজও মহামূল্য তা স্বীকার না করে উপায় নেই। মনে আছে ১৯৩৬ সালে এলাহাবাদে আনন্দভবনে ছোট এক সভায় স্বাধীনতা এবং সোশালিজম্ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে দুটো লাড্ডু রয়েছে একটা খেয়ে তার পর অন্যটা খেতে যাব, এমন ব্যাপার নয়—দুটো লাড্ডুই যাতে খেতে পাবার সম্ভাবনা ঘটে, তাই হল কাজ। এর চেয়ে সহজে ও স্পষ্টভাবে স্বাধীনতা আর সোশালিজমের লড়াই সম্বন্ধে কথা বলা যায় বলে জানি না। তাঁর নায়কতায় সম্প্রতি কংগ্রেস সোশালিজমকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে—এই ঘোষণাকে শঠতা বলা সহজ, কিন্তু তা বললেই কাজ শেষ হয় না, এবং এমন ঘোষণা ঘটারও একটা বৃহৎ মূল্য রয়েছে, যাকে অগ্রাহ্য বা বিদ্রূপ করা হল ভ্রান্তি। বাস্তবিকই মনে হয় যে স্তালিনের মৃত্যুর পর সবচেয়ে দামী কথা যে জওয়াহরলাল বলেছিলেন, তার একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে।

জওয়াহরলালকে কোথায় যেন ভারতপথিক বলে বর্ণিত হতে দেখেছি। মহাত্মা কবীরের শিক্ষাকেও 'ভারতপন্থ' বলা হয়েছে—হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার তিনি ছিলেন প্রতীক, আর সে-সাধনা ছিল সচল, জীবননির্ভর, অচলায়তনের প্রতিপন্থী। "বহতা পানী নিরমলা বন্ধা গন্দা হোয়"—যে জল বয়ে চলেছে তা হল নির্মল, বদ্ধ জলই হয়ে ওঠে দূষিত, দুর্গন্ধ। তখনকার জীবনে দুঃখ-দুর্গতি লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না—সেখানে সাধক বলেছিলেন "আঠ পহর কা ঝূঝ্‌না বিন্ খাণ্ডে সংগ্রাম।" অষ্টপ্রহর এই যুদ্ধ চলেছে, বিনা খড়্গের এই সংগ্রাম। ভারতবর্ষের চিরন্তন এ-সব কথা বর্তমান যুগে যাঁরা নতুন করে ভেবেছেন, জওয়াহরলালের স্থান সেই সংসঙ্গে। কবীর বলেছিলেন: ধরণী আকাশে চলেছে থরহরি, সকল শূন্য ভরে চলেছে গর্জন, তারই মধ্যে মৈত্রী ও সমন্বয়ের বাণী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ভিন্ন পরিস্থিতিতে, সামাজিক সম্ভাবনা যখন ভিন্ন প্রকৃতির তখন আজকের মহাত্মাদের যুগসম্মত চিন্তাকে প্রকাশ করতে হবে। জওয়াহরলাল সেই চেষ্টা করেছেন, আর ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও এমন ভাবে করেছেন যে মানুষ মনে রাখবে শতাব্দী ধরে তাঁর মমতা, তাঁর মনের করুণা, তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি

আর পরদুঃখকাতর মহত্ত্ব—যে-গুণাবলীর মূল্য বিপ্লবের নামে যেন হ্রাস করে দেখার প্রবৃত্তি আমাদের না হয়।

প্রায় অর্ধজগৎ আজ মার্কস্-কথিত সুসমাচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজবাদকে গ্রহণ করেছে, সাম্যবাদের পথে পদক্ষেপের প্রচেষ্টায় নেমেছে। দুটো বিরাট বিশ্বযুদ্ধ গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঘটেছে, রুশ সাম্রাজ্যে আর মহাচীনে সাম্যবাদী নেতৃত্বে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, মধ্য ইয়োরোপ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরতট পর্যন্ত সমাজবাদী শাসন স্থাপিত হয়েছে, সাম্রাজ্যের শৃংখল ভেঙে এশিয়া আফ্রিকা লাতিন-আমেরিকার বহু দেশ স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে, সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা বিনা সার্থক স্বাধীনতা যে অসম্ভব তা হৃদয়ঙ্গম করে যথাসাধ্য সোশালিজমের দিকে এগিয়ে চলার কঠিন প্রয়াসে নেমেছে। এমনই যুগান্তরকারী পরিবর্তন আজকের দুনিয়াতে এসেছে বলেই সাম্যবাদী অভিযানের পূর্বতন স্তরে চিন্তা ও কর্মে যে একাগ্র, এমন কি প্রয়োজন হলে নির্মম, কঠোরতা সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল, তাকে অনড়, অটল, অপরিবর্তনীয় মনে করারও বুঝি প্রকৃত কারণ নেই। এ-প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান অন্যত্র, কিন্তু জওয়াহরলাল নেহরুর মতো মানুষ সম্বন্ধে মনে হয় যে এঁরা বিপ্লবের যে মূল্য ইতিহাস বার বার নিয়েছে তা দেখে বিপ্লবপথ সম্বন্ধেই কুণ্ঠা বোধ করেছেন—সমাজের সনাতনী শোষণব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে যে সমাজকে অপরিসীম গ্লানি ও বেদনা সহ্য করতে হয়, তা মেনে এবং বুঝেও বিপ্লবের মূল্য দিতে সংকুচিত হয়েছেন, বিপ্লবের চরিত্রকে পরিবর্তিত করতেও তাই চেয়েছেন। একশো বছর কিম্বা আরও আগে আকাশচারী সাম্যবাদী যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও কল্পনা করতেন যুক্তি এবং হৃদয়বত্তার কষ্টিপাথরে যাচাই করে মানুষ সাম্যবাদকে বিনা সংঘর্ষে গ্রহণ করবে। তাঁদের সে-কল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল; কার্ল্ মার্কস্ এই গগনবিহারী কল্পনাকে তাই ধিক্কৃত করেছিলেন। কিন্তু ধিক্কার দিলেও 'ইউটোপিয়ান্' মনীষীদের অবদানকে সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নি। আজকের পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশে জওয়াহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি কিছু পরিমাণে ইউটোপিয়ান্‌দের উত্তরাধিকারী—তবে যে জগতে সোশালিস্ট শক্তিপুঞ্জের বর্তমান প্রভাব এবং জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের ক্ষমতা ও গভীরতা বিপুল, সেখানে বিপ্লবের পূর্বকল্পিত মূর্তির সর্বত্র পুনরাবৃত্তিকে অকাট্য মনে করা

চলে না। নানা পথে সমাজবাদে পৌছাবার সম্ভাবনার কথা আজ আমরা জানি। জওয়াহরলাল প্রকৃত সমাজবাদ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ চেতনা রাখতেন না, তাঁকে সমাজবাদী বলে ধরে নেওয়া যে ভুল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজবাদকে ভারতীয় পরিস্থিতিতে সহজ, স্বাভাবিক ও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার অনুকূল মানসিকতা ও প্রস্তুতিকে বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠ করতে তাঁর চিন্তা এবং দীপশিখার মতো সমুজ্জ্বল তাঁর বহু বাক্য অবশ্যই সাহায্য করবে।

জওয়াহরলাল ছিলেন যুগন্ধর মানুষ—তাই তাঁর সম্বন্ধ কথার উপর কথা সাজিয়ে যাওয়া সহজ। কথা বড় বেশি বলা হয়ে গেছে দেখে তাই অস্বস্তি আসছে। কী প্রয়োজন এত কথার? তবে বুঝি কথা বলে যেতে থাকলে মনের ভার কিছু কমে, আর হয়তো বা কথার মধ্য দিয়ে কিছু কাজেরও নিশানা মেলে।

১০ই এপ্রিল তারিখে লেখা তাঁর শেষ চিঠি হাতের কাছে রয়েছে। "তোমার বাংলা প্রবন্ধের বইটা পেয়ে সুখী হলাম, কিন্তু আমি তো বাংলা পড়তে পারি না, আমার লাইব্রেরিতে এটা থাকবে। তোমার চিঠি পড়লে আমার খুব ভালো লাগে। আমার শরীর খারাপ মনে করে যখন খুশি লিখতে সংকোচ কর না, তবে আগের মতো অবিলম্বে জবাব দিতে হয়তো পারব না।" কোনো কাজে বিলম্ব তাঁর ধাতে সইত না। তাই বুঝি অস্বাস্থ্যের বোঝাও বেশিদিন বইতে তিনি পারলেন না।

ডক্টর জাকির হোসেন সেদিন এক সভায় বললেন: জওয়াহরলাল ছিলেন "হিন্দোস্তান-কে মেহ্‌বুব্", সারা দেশের দুলাল। শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি নয়, এত ভালোবাসা কোথাও কোনো রাজনৈতিক নেতা লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের কাছ থেকে কখনও পায় নি। নিজের সঙ্গে অপরের ব্যবধান দূর করবার প্রায়-অসম্ভব ক্ষমতা বিনা এমন মহত্ব সম্ভব নয়। চারিত্র্যের এই ঐশ্বর্য জওয়াহরলালের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে জওয়াহরলালের ভূমিকা ইতিহাসে কীর্তিত হতে থাকবে। স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররূপে দেশগঠন ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁর প্রয়াসের বিবরণও ইতিহাস সহজে বিস্মৃত হবে না। কিন্তু নিছক রাজনীতির বিচারে শুধু স্তুতিই তাঁর প্রাপ্য নয়। বহু কঠিন ও কঠোর সমস্যা অপূর্ণ রেখে তিনি চলে গেছেন। অতি-মানবিক শক্তির

অধিকারী হয়েও অতি-মানবিক পদ্ধতিতে সেই শক্তি ব্যবহারে তিনি অপারগ ছিলেন। হয়তো এজন্যই তিনি কখনও বিপ্লবী ভূমিকায় নামতে পারেন নি; দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বনেও স্বীকৃত হতে পারেন নি। সংসারে রুচি ও প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য যতদিন না ঘটে, ততদিনই হয়তো তাঁর মতো ব্যক্তির জীবনে ও কীর্তিতে কিছু পরিমাণে ব্যর্থতা না থেকে পারে না।

এ-সব চিন্তা ছাপিয়ে আজ জওয়াহরলালের তিরোধানে স্বজনবিয়োগব্যথায় ভারতবর্ষ বিধুর। শিশুর হাসি আর ফুলের ছটা ছিল যার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, আসক্তির সঙ্গে নিরাসক্তিকে একসূত্রে বাঁধার শক্তি ছিল যাঁর চরিত্রমহিমা, সেই মহদাশয় ও একান্ত অনন্য মানুষটি আর নেই। শুধু অমর হয়ে থাকবে তাঁর স্মৃতি এবং তাঁর অজর অভীপ্সা:

সর্বস্তরতু দুর্গানি সর্বো ভদ্রানি পশ্যতু।
সর্বস্তদ্ব্দ্ধিমাপ্নোতি সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বদেশীর দলে ঢুকলাম না হল দীক্ষা, না বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান।

এ প্রসঙ্গেই তাই দু-একটা কথা বলা দরকার। বাঙলা দেশে একটা কথা বিশেষ প্রচলিত। মনে পড়ে, রাউলাট কমিশনের রিপোর্টেও সে মর্মের কথা আছে। সাম্যবাদী পত্র-পত্রিকাতেই একালে কথাটা অকাট্য বলে অধিক প্রচারিত। 'টেররিস্ট' দলগুলো তাদের সদস্য সংগ্রহ করত কালীপূজা করে। নানারূপ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও ছিল তার অঙ্গ—রক্তের ফোঁটা কপালে এঁকে মন্ত্র পড়ে সদস্যদের হত দীক্ষা। হয়তো তা হত কোনো কোনো দলে কোনো এককালে। আমি কিন্তু দলে যে গৃহীত হলাম তা ফোঁটা-চন্দন, পূজা-হোম কিছু করে নয়। কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনই ছিল না; প্রতিজ্ঞাপত্রেও সই করতে হয় নি, শপথও না। বরং এ কথাই একবার শুনেছিলাম বড়োদের মুখে, "অনুষ্ঠান দিয়ে মানুষকে বাঁধা যায় না। বন্ধন—স্বদেশপ্রীতির, নীতিবোধের, ধর্মবোধের।" হয়তো যে-বিশেষ দলে আমি অন্তর্ভুক্ত তাঁদেরই এটা বিশেষ মত ও বিশেষ নিয়ম। দলটা ছিল বরিশালের শঙ্কর মঠের সঙ্গে সংযুক্ত। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী তাঁর প্রতিষ্ঠাতা—'সরস্বতী প্রেস', 'সরস্বতী লাইব্রেরী' তাঁরই নামাঙ্কিত। ধর্মের ঝোঁক এ দলেও ছিল প্রবল, দেবদেবীতে অনাস্থা নেই, পূজা-হোমেও না। কিন্তু তাঁরা অদ্বৈতবাদী, তাই অনেক আনুষ্ঠানিক উৎকটতায় আস্থাহীন। কথাটা তাই এই—ওরূপ একান্ত সাম্প্রদায়িক দীক্ষা স্বদেশী দলে সর্বগ্রাহ্য বা সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। বিপ্লববাদের ইতিহাস-লেখকদের সে কথাটা বলা উচিত। আলোচকদেরও জানা প্রয়োজন। অবশ্য, গীতার ওপর শ্রদ্ধা প্রচারিত হত; তা পাঠ ছিল বাধ্যতামূলক না হলেও প্রায় সর্বজনীন। বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও সেবাধর্মের সঙ্গে নব্যহিন্দুত্বের হাওয়াও প্রবল বইত।

স্বাস্থ্য, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি চর্চার জন্য আবার জোর দেওয়া হত ব্রহ্মচর্য, সদাচার, ভগবদভক্তির ওপর। 'সেক্যুলর' নয়, বরং একটু বেশি রকমেই হিন্দু-ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় কথাটাও সত্য: 'ডাকাতি' ও 'হত্যা' এই বিশেষ 'টেররিস্ট' পদ্ধতি বিপ্লবীদের পেয়ে বসেছিল। শুনেছি স্বয়ং অরবিন্দ প্রথম থেকে 'টেররিস্ট'-এর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পি. মিত্র প্রভৃতি গোড়ার অনুশীলনবাদীরা তা চাইতেন না। পরে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। তবু কোনো কোনো দলের আদর্শ ছিল, গুপ্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হলে বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধ। যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মত এ সম্বন্ধে ছিল সুদৃঢ়। নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তবু ডাকাতি গুপ্তহত্যা প্রভৃতির গ্রাসে গিয়ে পড়েছে কার্যপরম্পরায় স্বদেশী দলগুলো। বারবার তা থেকে নিবৃত্ত হতে চেয়েছে। কিছু দিনের মতো হয়েছে, আবার পথ না পেয়ে সেই পদ্ধতির শরণ নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু স্বদেশী গুপ্ত আন্দোলন সমগ্রভাবে কোনো কেন্দ্রীয় সমিতির দ্বারা চালিত হয় নি। এমনকি, শুধুমাত্র দুটি সমিতি—'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর'—তা চালিয়েছে, এমনও নয়। কাজেই কার্যধারায়ও ছিল বিভিন্নতা। দীর্ঘ ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছরে পর্বে পর্বে তাদের পরিবর্তনও হয়েছে। সদস্য বদল হয়েছে। চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। আদর্শ বিবর্তিত হয়েছে। কার্যপদ্ধতিও একরূপ থাকে নি। 'রিভোল্যুশনারি ন্যাশনালিজম' থেকে সোশালিজম্-এর দিকেই এই বিবর্তন—মোটামুটি। কাজেই 'টেররিজম্' বললেও তার নীতির প্রতি সুবিচার হবে না। এ আন্দোলনের কথা বলতে হলে—বলা উচিত: 'জাতীয় বিপ্লববাদ', 'বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন',—এরূপ কিছু বলা সমীচীন—'টেররিজম্' নয়।

কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের মতাদর্শ বা তার বিচার আপাতত নিষ্প্রয়োজন। সে আন্দোলনের কর্মধারারও সামগ্রিক বিশ্লেষণ এখানে অনভিপ্রেত। আর তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দান তো আমার পক্ষে অসাধ্য। গুপ্ত সমিতির বীজ তার নিজের নিয়মেই সমিতির মধ্যেও থাকে চক্রে চক্রে সীমাবদ্ধ—একজনার কাজ অন্যজনা জানে না, আলাপ-আলোচনা নিকটতমদের মধ্যেও নিষিদ্ধ। এক সমিতিতে অন্য সমিতির কাজ জানবার কথা নয়। আমি ওসব দিক থেকে চুনোপুঁটি অথবা শুধু 'রোলিং স্টোন'। সেই গড়িয়ে-চলার পথে যেটুকু অভিজ্ঞতা তা সামান্য। আর তারও সেই অংশটুকুই উল্লেখযোগ্য যা এই রূপনারানের কূল ঘেঁষে গিয়েছে।

(ঙ) পুঁটিমাছের কথা

'বীর বাদলের' দেশোদ্ধার কিরূপ ছিল? যুদ্ধক্ষেত্রে যবন সেনানীর উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব আমার কাজ বিপ্লবী সাহিত্যে, বইপত্র রাখা। পড়ার ঘরে প্যাকিং বাক্সের আলমিরাতে দু-ভাই-এর পড়ার বই থাকত। সেখানে পাঠ্য বই-এর পিছনে ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতিও লুকিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলাম। এখন 'দেশের কথা', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি রাখতেই বা পারব না কেন? সেই ঘরেরই আরেক পাশে বাঁশের মাচায় আমাদের পরিচারকরা ঘুমোয়। এদিকের তক্তপোষে বসে আমরা পড়ি। ঘরের মাস্টার মশায় এলে পড়ান, বন্ধুবান্ধব এলে গল্পও করি—আলমিরারও তালা নেই এবং না থাকাই লোকের কৌতূহল উদ্রেকের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। 'দেশের কথা', ম্যাৎসিনি গ্যারিবল্ডীর জীবনী, সিরাজদ্দৌলা, স্কুল লাইব্রেরি থেকে আমারই চুরি-করা গেরিলা যুদ্ধের নানা বই, অরবিন্দের পত্র, পরে 'প্রবর্তক',—এমনি সব নানা বই সেখানে থাকত স্বচ্ছন্দে। সে-সব বইপত্র যাতায়াত করত নানা লোকের কাছে। তাদের আমার চেনা উচিত নয়, অনুমান করতে পারতাম। আরও পরে, বইপত্র রাখা এবং চালান দেওয়ায় যখন আমি অভিজ্ঞ, তখন বই-এর স্থানটা আরও একটু ভিন্ন রকমের জিনিস গ্রহণ করল। তাও চালাচালিতে আমাদের দু'ভাই-এর সাফল্য মন্দ দেখা যায় নি। সেই তালাহীন আলমিরার বই-এর পিছনে নির্বিবাদে যে-সব জিনিস স্থান পেয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি মশা'র পিস্তল—কাঠের বাঁট সুদ্ধ ও জিনিসটিকে সামলানো সহজ নয়। রডা কোম্পানিরই চোরাই মাল। কত পথ ডিঙিয়ে এসে আমার আলমিরায় পৌঁছে, এবং কতখানে বারে বারে দু-এক মাসের মতো ঘুরে এসে আবার সেখানেই বিশ্রাম করে—যতদিন পর্যন্ত কলেজের শিক্ষার ডাকে আমি নোয়াখালি ত্যাগ না করি ততদিন তা ছিল আমারই জিম্মায়।

প্রথম দিকেরই আরেকটা কথা বলা দরকার। যবন-সেনানীর আবির্ভাব অসম্ভব ছিল—তারা তখন ইউরোপে, মেসোপোতামিয়ায়। তারা যখন, মনে হয় সময়টা তখন ১৯১৫-এর শেষ—আমরা যখন স্বদেশীর তালিম দিচ্ছি আমার সে শহরের স্বদেশী দলের দোসররা যে-সব জিনিসের তখন তালিম দিচ্ছেন তা কম অর্থব্যঞ্জক নয়। ব্যায়াম, জিমনাষ্টিক, হাঁটার প্রতিযোগিতা, দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাইকেলের নানা রেস্—এসব তখন স্কুলে স্কুলে বেড়ে

যাচ্ছে। সৈনিকের গুণ চাই, সক্রিয় উদ্যোগ চাই, কষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। বিভিন্ন স্কুলের দুরন্ত খেলোয়াড় ছেলের বন্ধুগোষ্ঠী নানারূপ দূর পাল্লার হাঁটায়, দৌড়ে, সাইকেল-চালনায় কী সূত্রে যে মেতে উঠছে তা কর্তারা না বুঝলেও আমাদের বুঝতে দেরি হয় নি—সম্ভবত পুলিশেরও না। সন্ধ্যার পরে যজ্ঞেশ্বর উপেন সাধু প্রভৃতির আমার প্রায় কাছাকাছি দু রকমের ছোট ছোট ঝাণ্ডা নিয়ে যে-সব ভঙ্গি করে তারই নাম স্কাউটিং—তাতে দূর সিগন্যালও হয়। আমিও দু-একটু শিখতে পেলাম। কিন্তু আমি তো আর সন্দীপে বা সমুদ্রের চরে গিয়ে ওসব নিয়ে অপেক্ষা করব না। বয়স নিতান্ত কম, শহর ছেড়ে আমরা দু'ভাই কখনো বাইরে যাই নি। কিন্তু সিগন্যাল যে না শিখলেই নয়—জাহাজ এসে যেতে আর দেরি নেই। কথাটা খুবই আভাসে বুঝতে হয়। কিন্তু উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা এত প্রচুর যে না বুঝে পারা যায় না। আসছে, আসছে, আসছে। তারপর অধীরতা দেখা দেয়—কবে আসছে, কই আসছে? তারপরে সংশয়—আসছে না যে! তবে কি আসছে না? শেষে আসবে না? বুড়ি বালামের তীরে সংঘর্ষটা শেষ হলে দিনে দিনে বোঝা গেল—না এলো না। ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের জাহাজ-বোঝাই অস্ত্র দেশে পৌঁছল না—গোলমাল হয়ে গেল।

গোলমাল হয়েছে। 'স্বাধীন ভারত' জানাল—"না হতে তোমার বোধন জননী রাক্ষসে ভাঙিল মঙ্গল ঘট"—আবার বোধন চাই—তৈরি হও, তৈরি হও। আমাকেও বলা হল নতুন ছেলেদের দলে টেনে আনো—অন্য স্বদেশী দলেও অনেক ছেলে দেখছ তো। 'অন্য দল' কথাটা সেই প্রথম শুনলাম। তাই একটু বিস্মিত হলাম—একদল নয় স্বদেশীরাও?—যা নয় তা মেনে নিতেই হয়। আর মেনে নিয়ে দেখলাম—শহরে এমন যোগ্য ছেলে শতকরা আর ক'জন আছে যারা কোনো না কোনো স্বদেশী দলে ভুক্ত হয় নি—এমন ভালো ছাত্র, এমন চরিত্রবান্ যুবক, স্বাস্থ্যবান, এমন অবস্থাপন্ন—হাঁ, 'অবস্থাটাও' একটা বিশেষ গুণ—চোদ্দ থেকে চব্বিশের মধ্যে যাদের বয়স এমন যুবক আর ক'জন আছে? এ কথা বলার অর্থ নোয়াখালির মতো ঝিমন্ত কোণের এই পরিস্থিতি থেকে পূর্ব বাঙলার যুব-জগতের সেদিনকার (১৯১৫-১৯১৭) চিত্র সহজেই অনুমান-সাধ্য। 'চোখে পড়ে' এমন যুবক সেদিন সে-সব শহরে স্বদেশী দলের বাইরে থাকতে পারে নি। থেকেছে—পরিহার্য বিবেচিত হলে। অর্থাৎ মুসলমান হলে। হলে সরকারী বড়

চাকরের ছেলে। কিম্বা সন্দেহভাজন বা চরিত্রহীন বলে নির্ভরের অযোগ্য। তা ছাড়া থেকেছে যদি আমার মতো অযোগ্য কেউ নেয় তাকে দলে টানার ভার। কারণ, একটি বন্ধুকে ছাড়া আমি সত্যই আর কাউকে স্বদেশীতে টেনেছি বলে নিজে মনে করি না। যারা এসেছে, এসেছে নিজের গরজে। গরজটা বন্ধুটিরই ছিল সমধিক।

একটা মজার গল্প এ প্রসঙ্গে বলতে পারি। বৈঠকখানার সান্ধ্য বৈঠকে অনেকের মতোই মাঝে-মাঝে আসতেন আমাদের প্রতিবেশী গোয়েন্দা ইনস্পেকট্র শরৎ দাস মশায়। এ-শহরে তিনি বদলি হয়ে এসেছিলেন কিছুকাল আগে। স্বদেশীর গল্পও বৈঠকখানায় উঠত তাঁর সামনে। সত্য ও সহজ উত্তরই তিনি দিতেন। জিজ্ঞাসা করেন সেদিন কেউ কেউ—"কেন ওরা (স্বদেশীরা) ডাকাতি করে?" শরৎবাবু বললেন, "না হলে টাকা পাবে কোথায়?" "টাকার কি দরকার?" "অর্গ্যানিজেশন-এ টাকা লাগে।" "অর্গ্যানিজেশনে এত কি লাগে?" "লাগে বইকি। ডাকাতি বা গুলি তো শুধু নয় সবখানেই গড়তে হয় অর্গ্যানিজেশন। সব খবর রাখতে হয়। সব খবর রাখেও। এই যে আমরা কথা বলছি তাও ওরা হয়তো জানতে পারবে।" আমি ঘরের একপ্রান্তে তখন লেখার নাম করে একটা খাতা নিয়ে বসেছিলাম। স্বদেশী কোথায় নেই সেদিন পূর্ব বাঙলায়?

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা কথার ও ঘটনার তালিকা না বাড়িয়ে মোদ্দা কথাটায় আসা যাক। সেটা প্রথম মহাযুদ্ধকালীন স্বদেশীর পর্ব—আমি তার চুনোপুঁটিও নই। কিছুকালের মধ্যেই বোঝা গেল—কলকাতার মোটর-ডাকাতি আর বালেশ্বরে যতীন মুখুজ্জের আত্মাহুতি থেকে শেষ কৃষ্ণনগরের ডাকাতি, আসাম-উত্তর ভারতের নানা বিদ্রোহ চেষ্টা থেকে ভবানীপুরে বসন্ত চ্যাটুজ্জের হত্যা পর্যন্ত, যে-সব অসমসাহসিকতার ও আয়োজনের ফলে দেশের লোক চমৎকৃত, তাতে জার্মান অস্ত্র নিয়ে জাহাজ এল না, সিপাহীরা এক-আধজনা প্রাণ দিল, কিন্তু দ্বিতীয় সিপাহী যুদ্ধও সম্ভব হল না। সে-সব ঘটনাসূত্রে কিন্তু যাঁরা সারা দেশের বিপ্লব আয়োজনের কর্মী, ছোটো-বড়ো-মাঝারি, তাঁরা আর কেউ বাইরে থাকছেন না। বিপ্লবের চেষ্টাটাও শেষ পর্যন্ত ঠেকছে গিয়ে সংগঠনরক্ষায়, ডাকাতিতে ও গুপ্তহত্যায়। তাতে কিছুই ঠেকানো যায় না—চাপা-পড়া উত্তেজনা তাই দিশা হারিয়ে দুঃসাহসেই খোঁজে আত্মতৃপ্তি। পুলিশের জালটা দেশের

উপর ছড়াতে ছড়াতে সে শহরের ওপর ছড়াতে তবু দেরি করছিল—ওখানকার যুবকেরা কলকাতায় ও অন্যত্র গেলে ধরা পড়ছে—কেউ কেউ তারা সেরা ছেলে, কেউ সম্মানিত সজ্জন—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বসু, ত্রিবেণী শূর ইত্যাদি। তারপর পুলিশের এক গুপ্তচর নিহত হল শহরের পথে একদিন শীতের সকালে। কেউ অবশ্য ধরা পড়ল না। কিন্তু ভারতরক্ষা আইনের জালটা এবার শহরেও ছড়িয়ে পড়ল। বড়োরা গেল—নগেন্দ্রবাবু, ক্ষিতীশ রায় চৌধুরী, প্রভৃতি। মেজরাও যে কতদিন ফাঁকি দিতে পারবে তা সন্দেহ। কয়মাস পরে একবার জানা গেল—যজ্ঞেশ্বর, উপেন, প্রভৃতিও পরদিন সকালেই জালবদ্ধ হবে, আমার ভাই-এরও নাম আছে সে তালিকায়। আমাকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল না। আমি তখনো এত ছোট যে গুপ্তচরেরও চোখ পড়ে না। আর, বন্ধুদেরও এত স্নেহের যে, আমাকে সকল সন্দেহের বাইরে রাখতেই তাঁরা সযত্ন। যাক, উত্তেজনায় রাত কাটল। কিছু হল না। পরে শুনেছি—স্থানীয় গোয়েন্দার কর্তা সেই শরৎ দাস মশাই নাকি এজন্য দায়ী। তিনি উপরওয়ালা সাহেবকে বোঝালেন, "ওরা আমার চোখের ওপরে থাকে; সকাল-সন্ধ্যা চোখে-চোখে রাখতে পারি ওদের। কেন তাহলে ওদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা—ছেলেগুলো পড়াশুনায়ও ভালো।" এমন কাণ্ডজ্ঞান ও শুভবুদ্ধি যদি অন্য গোয়েন্দাগুরুদের থাকত তাহলে অনেক ভ্রান্তির হাত থেকে ইংরেজ সরকারও বাঁচত, দেশের মানুষও নিস্তার পেত। কারণ, ক'মাস পরেই মহাযুদ্ধের পর্ব শেষ হবার আগেই—আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের ছটফটানিতে কোনো ফায়দা নেই।

সেই মেজ-সেজরা পাশ করে একে একে চলে গেল কলেজে। আমিও একবৎসর পরেই এগিয়ে গেলাম। বই-অস্ত্র, জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বুঝলাম—ব্যস্ত হয়েই বা কি হবে? অনেক কাজ বাকী। গোড়ার কাজও হয় নি।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা ইঙ্গিত আবার মনে জাগতে লাগল। বিবেকানন্দের প্রেরণার আগুনে শুধু না জ্বলে তাতে প্রদীপ জ্বালানোর মতো সুযোগ রচিত করে দিতে চাইল কবির বাণী। 'প্রবাসী'র পাতা থেকে 'ছোট ও বড়' আর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এসে সেই পুরনো অনবলুপ্ত বোধকেই আরও জীইয়ে তুলল—"যারে তুমি নিচে

ফেল সে তোমার বাঁধিবে যে নিচে" আর "রাক্ষসে মঙ্গল ঘট ভাঙবে" কি ?

'মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে'—

তারটা উঁচুতে হোক নিচুতে হোক, আরেক গ্রামে বাধা হচ্ছিল। যখন বাজবার দিন আবার এল, নন্ কো-অপরেশনের শেষ বেলায়, তখন তাতে সন্দেহ রইল না।

(চ) যজ্ঞেশ্বর দত্ত

'স্বদেশীর' প্রথম পর্বটা ওই স্কুলের সঙ্গেই শেষ। এই পাঠটা যাঁদের কাছে পেয়েছিলাম, যাঁদের সঙ্গে নিয়েছিলাম, ওই শহরের ও ওই বয়সের পরিধিতেই তাঁদের সঙ্গে পরিচয়। তবে অনেকের সঙ্গে পরিচয় বয়ে চলেছে পর্ব-পর্বান্তরে। যজ্ঞেশ্বরের কথা বলেছি; অথবা বলা হয় নি। বেশি কথা তার সম্বন্ধে বলা দুর্ঘট। বললেও তাতে তাকে প্রকাশ করা হবে না। কারণ, সে স্বভাবেই অপ্রকাশিত। প্রকাশেই যে বিব্রত হয়, এমন মানুষ। নন্ কো-অপারেশন-এর ঝড়-ঝাপটার পরে বি-টি পাশ করে শিক্ষাব্রত নিয়ে সে আপনাকে সঁপে দিতে গিয়েছিল মনের মতো কাজে। গ্রামের স্কুলে, ছাত্রদের সমাজসেবার আদর্শে সচেতন করতে, কৃষক-খাতকদের মধ্যে সমবায়-নীতির প্রবর্তনে, পল্লীমঙ্গলে। তারপর এল (১৯৩০) আইন-অমান্যের দোলা। আবার, তুলতে হল তার নোঙর, নিতে হল ছেঁড়া-পাল আন্দোলনের হাল সেই শহরে সে সময়ে। তারপর? আমি তার খেই আর খুঁজে নিই নি। সে ফিরে গেছল তার শিক্ষকতার অজ্ঞাতবাসে, লোকহিতের অবিজ্ঞাপিত কাজে। সম্ভবত শিক্ষক কোথাও। অনেক তাঁর গুণ ছিল; প্রধান গুণ প্রকাশে কুণ্ঠা। সব গুণের মতো তাঁর বিনয় নম্রতা—তাঁর দোষও হয়ে যায়। কর্তব্যবোধ যাঁর বেশি জাগ্রত, সে কেবলই দেখে কর্তব্য সম্পূর্ণ পালিত হচ্ছে না, আর এই বোধে নিজের কাছেই নিজে থাকে সে সঙ্কুচিত, অপরাধী। মনোবিবালকর শাস্ত্রে বোধহয় একেই বলে 'ম্যাসেসিজম্'। বলুক, ও নামে কাজ নেই। এ দেশের কর্মযোগীর নামহীন তালিকায় যদি এরূপ মানুষের সংখ্যা সামান্য হত তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্রোতটা—শুধু কাগজের পাতায় ফাঁপানো প্রচারিত নাম আর ঘটনার ফুঁ-দেওয়া হাওয়া

সত্ত্বেও অজস্র বাধার মধ্যে প্রবাহিত হতে পারত না। যজ্ঞেশ্বর দত্ত সেই সংবাদপত্রের উপেক্ষিতদের দলে।

(ছ) নগেন্দ্র গুহরায়

যজ্ঞেশ্বর আমাকে দলের যে লোকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল তিনি অপরিচিত তখনো ছিলেন না, এখনো নন। তিনি সে শহরে সে দলের নেতা—আমারও প্রথম নেতা। মনে হয়, তাঁর যে-গুণ তা গুপ্ত সমিতির প্রয়োজনীয় গুণ নয়—প্রকাশ্য আন্দোলনের গুণ। ১৯৩৯ সনে পুরুলিয়ার একটি ছাত্র সম্মেলনে আমি গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন যিনি (তৎপূর্বে আমার অদেখা কিন্তু বহুশ্রুত) নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। বাঘা যতীন-এর পরে তিনিই ছিলেন দলের নেতৃত্বভার নিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, "আমাদের কালে স্বদেশীতে মন্ত্রগোপনের চর্চা করতে হয়েছে, এখনকার দিনে চর্চা করতে হয় মন্ত্রপ্রচারের। দু-কালের দু-পদ্ধতি।" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রকাশ-ধর্মী মানুষ। সেই অপ্রকাশ্য দিনের কথা প্রকাশেও তিনি এদিনে কম যত্ন করেন নি। প্রকাশই তাঁর স্বধর্ম—লেখায়, বলায়। তাঁর মুখেই শুনেছি—স্বদেশীর দিনে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি যখন পূর্ববাঙলায় নিষিদ্ধ হয় তখন বোধহয় কর্তৃপক্ষের আয়োজনে শহরের গণ্যমান্যরা সে নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করতে সভা ডাকেন। সকলের সম্মানিত ছিলেন এক পণ্ডিত মহাশয়। তিনি ছাত্রদের বলেন, "কেউ মারা গেলে আমাদের দেশে ওরকম হরিধ্বনি দেয়। মা কি মারা গিয়েছেন যে তোমরা ওরকম 'বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং' ধ্বনি তুলবে!" নগেন্দ্রনাথ তখন তের-চৌদ্দ বৎসরের কিশোর। দলসুদ্ধ সভায় ছিলেন। দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বললেন, পণ্ডিত মহাশয়ের উপদেশের পরেও—"সত্য কথা। আমাদের দেশ আমাদের মাতা। সে-মাতা আজ সত্যই মৃতা, বা মৃতকল্পা। তাই আমরা এই ধ্বনি দিচ্ছি—বন্দেমাতরং।" সাহস শুধু নয়। তুমুল কাণ্ড। সভার ভেতরে-বাইরে দুর্দান্ত ছেলেদের ধ্বনি উঠল 'বন্দেমাতরং'। প্রকাশ্যে সেই ঘোষণা থেকে নগেন্দ্রনাথের স্বদেশী-জীবনের সূচনা। কিশোর নগেন্দ্র অবশ্য তখন সরকারী বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হন। কলকাতায় 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গৃহে তিনি আশ্রয় পান। সেখানে তিনি ন্যাশনাল কলেজ থেকে লেখাপড়া করেন, পাশও করেন। আবার, সে গৃহেই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে,

তার পরে চন্দননগরের ('প্রবর্তকের') মতিলাল রায় মহাশয়দের সম্পর্কেও আসেন—সে-সব বিবরণ তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি তা লিখেছেনও। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার কিছু আগে নগেন্দ্রনাথ নিজের শহরে আবার ফিরে আসেন—সম্ভবত এ শহরের এই স্বদেশী দলের ভার তিনি পেয়েছিলেন। এখানে নতুন করে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি জুবিলী স্কুলের মাস্টার হলেন। কিছুদিন বাড়িতে আমাদের শিক্ষকও ছিলেন। কিন্তু তার আগেই আমরা সেই স্বদেশী দলে ঢুকেছি, তিনিও আমাদের নেতা। নগেন্দ্রবাবু প্রবীণ ভদ্রলোকদের ছিলেন স্নেহের পাত্র। সুদর্শন যুবক, পৌরুষব্যঞ্জক রূপ, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান, সকলের সঙ্গেই কথাবার্তায় সুপটু। সব থেকে বড়ো কথা—তিনি সুবক্তা, এবং সে-কথাটা তিনি জানেন, আর, তাই সেই সুযোগ বড় নষ্ট হতে দেন না। কিন্তু আর একটা কথা বুঝি আরও বড়ো—তিনি বাঙলায় সুলেখক, তাঁর দেশপ্রীতির মতো এইটাও তাঁর কম গর্বের বিষয় ছিল না। নগেন্দ্রবাবু সে বয়সেই গ্রন্থকার। দু-একখানা বই ('বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') আমাদের সুপরিচিত। এমন মানুষের গুণমুগ্ধ হতে অসুবিধা হয় নি। অবশ্য বাঙলা রচনায় তিনি তখন রবীন্দ্র-বিরোধী, চলতি ভাষার বিরোধী। সাধু ভাষায়ও ঋজু অপেক্ষা আলঙ্কারিক রীতির ভক্ত। সেরূপ শব্দযোজনায়, সেরূপ পল্লবিত রচনায়, বক্তৃতাতে, বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যে তিনি আমাদের মনোহরণ করেছিলেন। সে ভাষা প্রলুব্ধও করত। তবু সংশয় জুটত। বাড়ির ধারায় আমরা 'পাকা', অর্থাৎ রবীন্দ্রানুরাগী। আর দাদার শিক্ষায় আমরাও শুনতাম—ভাষার বাহাদুরীই লেখার শেষ কথা নয়, 'থট্' বলেও একটা জিনিস দরকার। তাই মাঝে-মাঝে দোটানায় পড়তাম। আসলে এটা একই বিশিষ্ট প্রকৃতির দু'মুখী টান—স্বদেশীর টান ও সাহিত্যের টান। আমরা তার মাঝখানের জায়গাটায় দাঁড়াতে চাইতাম, কিন্তু তেরো-চোদ্দ বছরে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারব কেন? আর একটা দু'মুখী টানও তার সঙ্গে ছিল—তা সূক্ষ্মতর। একদিকে ভাবালুতার টান অন্য দিকে শিল্পরুচির টান। এ দু-টানের মধ্যে তাল রাখা চুয়ান্ন বছরেও কঠিন—চৌদ্দতে তো দূরের কথা। যাই হোক, স্বদেশীর ভাবালুতাতে নগেন্দ্রবাবুই নেতা—আর তাঁর অলঙ্কার-বিজড়িত লেখায় আমরা মুগ্ধ। আমরা দু-ভাই সাহিত্যানুরাগের জন্য নগেন্দ্রদা'র বিশেষ স্নেহ লাভ করেছিলাম। পরেও—আমার স্বদেশী-ভাবনা

আর নগেন্দ্রবাবুর স্বদেশী-কর্ম তখন বিভিন্নমুখী—আমি তাঁর স্নেহ পেয়েছি, আদর পেয়েছি, তাঁর গৃহে আতিথ্য উপভোগ করেছি। তাঁর সব কথা গ্রহণ করতে না পারলেও আমার বয়ঃকনিষ্ঠ কর্মীদের মতো তাঁর প্রতি আস্থা হারাই নি। নানা গুণের মানুষ হিসাবে তাঁর বিরোধিতা জেনেও তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতাম, আর বয়ঃকনিষ্ঠদের থেকে সেজন্য লাভ করতাম একটু সহাস্য ব্যঙ্গ। দোষ তাঁদেরও নয়। কিন্তু সত্যই অনেক গুণ ছিল নগেন্দ্র গুহের—আমার বিশ্বাস অবস্থার বৈগুণ্যেও যতটা সম্ভব তিনি তাঁর সার্থকতা সম্পাদন করেছেন। কিন্তু ঐ 'অবস্থার বৈগুণ্য'টাও বুঝবার মতো। যেমন, বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির যা প্রয়োজনীয় গুণ তা নগেন্দ্রদা'র বিশেষ ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি প্রকাশজীবী মানুষ। স্বাদেশিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তিনি ঠিক জায়গায় নিজের স্থান করতে পারতেন। যে-প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রাপ্য—তা স্বাভাবিক ভাবে আপন যোগ্যতায় অধিকৃত হত। কিন্তু গুপ্ত সমিতির কাজে তিনি কতটা সত্যই সফল তা আমার জানা নেই, বড়োরা জানতেন। দেখতাম, তাঁরা তত বড়ো বলতেন না। অবস্থার দ্বিতীয় বৈগুণ্য এই—স্বদেশীতে পোড় খেতে-খেতে জীবিকার দায়ে তাঁকে হতে হয় মোক্তার—যখন মোক্তারদের গৌরবের কাল অস্তমিত। অসহযোগে তবু তিনি এগিয়ে না গিয়ে স্থির হতে পারেন না; আইন-অমান্যেও এগিয়ে যান। সে-সব সূত্রে তাঁর প্রকাশধর্মী স্বভাব সেটাই মুক্তি পায় বেশি। নেতাদের মতোই তাঁর নাম তখন সুপ্রচারিত। তিনি তাই প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মোক্তারি ত্যাগ করে নামকর্মে ঘুরপাক খেতে লাগলেন। কিন্তু সেই ঘূর্ণীচক্রে একটা-না-একটা জীবিকা আশ্রয় না করেও যে দাঁড়াবেন এমন তাঁর আর্থিক সামর্থ্য নেই, সামাজিক সুবিধাও নেই। তাতে করেই অনেক চেষ্টায় এক-একটা সুযোগ তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়। অথচ সেইসব সুযোগ সীমাবদ্ধ, সুচিরস্থায়ীও নয়। তবু তারি মধ্যে তিনি নিজের স্বাভাবিক শক্তি ও উদ্যমের বলে কাজে ও লেখায় নিজেকে প্রকাশিত করতে পেরেছেন—চাপা পড়েন নি। ব্যক্তিগত প্রীতি-শ্রদ্ধার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নগেন্দ্রবাবু স্বদেশীতে আমার প্রথম নেতা—নগেন্দ্রবাবুর পুরুষকারও স্বীকার্য।

(ক্রমশ)

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা

"The greatest service that you can render to the communist cause is not to make an apology for it, but to criticize it frankly and truly."

Romain Rolland : I Shall Not Rest

ছোটবেলায় ছড়াতে পড়েছিলাম 'কাজের ছেলে' বাজার করতে বেরিয়েছিল "দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল, চিনিপাতা দৈ" কিনতে। পথের ঘটনাবৈচিত্র্যের আকর্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে সে যখন বাজারে এসে পৌঁছুল, তখন তার মুখে নিত্য-আওড়ানো তালিকাটি "দাদখানি বেল, মুসুরির তেল, সরিষার কৈ"—এই রূপ নিয়েছিল। বর্তমান চীন ও সোভিয়েতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের হাতে পড়ে মার্কসবাদ তার তত্ত্বের কৌলীন্য হারিয়ে অনুরূপ বিকলাঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। নিজেদের দেশের অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ও বিশ্বে শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রামের দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করতে করতে তাঁরা উভয়ই বিস্মৃত হয়েছেন মার্কসবাদের মূল উদ্দেশ্যের কথা।

তাই চীন-সোভিয়েতের পরস্পরের বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, তার সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক দিক তাদের নিজেদের সমর্থনে মার্কসের নামের ব্যবহার। পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের তাগিদে মার্কসের তত্ত্বকে যথেচ্ছভাবে দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শের প্রতি সবচেয়ে বড় অপরাধ।

মার্কসীয় তত্ত্বের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের এই জাতীয় সুযোগ দানে মার্কস ও এঙ্গেল্স্ স্বয়ং বোধহয় কিছু অংশে দায়িত্বভাগী। তাঁদের জীবিতকালে মার্কস ও এঙ্গেলসকে নানা ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লেখনী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ভাববাদী দর্শন, যান্ত্রিক বস্তুবাদ, সুবিধাবাদ,

নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি তদানীন্তন ইউরোপীয় চিন্তাগজতের ভিন্নধর্মী ও অনেক ময় পরস্পর-বিরোধী, প্রবণতার বিরুদ্ধে লিখতে হয়েছিল। ফলে তাঁদের কোনো কোনো রাজনৈতিক রচনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশেষ কোনো মত খণ্ডন করার প্রয়োজনে মার্কসীয় তত্ত্বের কোনো বিশেষ দিকের উপরই সম্পূর্ণ জোর গিয়ে পড়েছে, অন্যান্য দিকগুলি অবহেলিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ব্লখ্ (Bloch)-কে লিখিত এঙ্গেল্সের পত্রের সেই বিখ্যাত অংশটি উল্লেখযোগ্য : "তরুণ লেখকেরা কখনও কখনও (ঐতিহাসিক বস্তুবাদের) অর্থনৈতিক দিকের উপর যতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তার থেকে অনেক বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ; এর জন্য মার্কস এবং আমি অংশত দোষী। আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়রা, যাঁরা এদিকটি অস্বীকার করতেন, তাঁদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা এই মূল তত্ত্বটির উপর জোর দিতে বাধ্য হই। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, গতি-প্রকৃতির মধ্যে আরও যে-সব তাত্ত্বিক উপাদান জড়িত রয়েছে, সেগুলিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেবার স্থান, কাল বা অবকাশ সব সময় আমরা পাই নি।" (১৮৯০)

তাই সাময়িক প্রয়োজনে যে-সব লেখা রচিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের সুবিধা অনুসারে কিছু বাক্য উদ্ধৃত করে সেগুলিকে বিশুদ্ধ মার্কসবাদের 'ট্রেড-মার্ক' হিসেবে ব্যবহারে আত্মপ্রসাদ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো, মার্কসীয় তত্ত্বের অসম্পূর্ণ ও বিকৃত উপলব্ধিরই তুল্য হবে।

বিক বস্তুবাদ

কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রতি যুগে পুনরাবৃত্ত ভ্রান্তির বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে যদি মনে রাখা যায় যে মার্কসবাদ মূলত একটি প্রয়োগ-প্রণালী যার ভিত্তি বস্তুবাদ-বিশ্বাস ও দ্বান্দ্বিক-রীতি। বস্তুর ক্রমবিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি মানব ও সেই মানব ইতিহাসে এ পদ্ধতি নিয়োগ করেই মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে, সে সমাজে মানুষের মানবীয় সত্তা সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পথে, বা মার্কস-ব্যবহৃত পরিভাষায় বলা চলে, সে সমাজে মানুষ তার প্রকৃতির অন্তর্নিহিত চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন (estranged)। এই সত্তার অবলুপ্তি বা বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে চরম ও পরিপূর্ণ রূপ শ্রমজীবীশ্রেণীতে। তাই তারাই

ধনতান্ত্রিক সমাজের সকল স্তরের অত্যাচারিত মনুষ্যজাতির প্রতিমূর্তি এবং
তাদের বন্ধন-মোচনেই বিশ্বমানবের মুক্তি। এই কারণেই মার্কসের তত্ত্বে
শ্রমজীবী আন্দোলনের পথনির্দেশ এবং তাঁর কর্মে তার সংগঠন, এত
গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে রয়েছে।

এর সূত্র ধরে মার্কস সমসাময়িক সমাজ, অর্থনীতি, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য—
এক কথায় মানুষের সৃষ্টির সমগ্র জগৎ প্রসঙ্গে ক্রমবিকাশের কয়েকটি নিয়মের
ইঙ্গিত মাত্র করে গিয়েছিলেন, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাঁর মতে, সমাজতন্ত্রর
প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি-মানবের মুক্তি ও সৃজনক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির
মূল চরিত্র তাই মানবতাবাদী।

মার্কসবাদের প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তীর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান ও ক্রমপরিবর্তনীয়।
তাই মার্কস তাঁর যুগে যে সকল ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ করেছিলেন
তার অনেকগুলিই আজ আরও ব্যাপকতর হয়ে উঠছে, অনেকগুলি পরিবর্তিত
হচ্ছে এবং আরও নিত্য-নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে মার্কসের কিছু
সিদ্ধান্তকে প্রসারিত করার সুযোগ এসেছে, নতুন পরিস্থিতি উদ্ভাবনার
ফলে কিছুর পরিহার বাঞ্ছনীয় এবং অন্যান্য অবহেলিত ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক
বস্তুবাদকে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। মার্কসবাদের ক্রমবিকাশ এই
ভাবেই সম্ভব।

দুর্ভাগ্যবশত মার্কসবাদের এই বিকাশশীল চরিত্রটি সাম্যবাদী আন্দোলনের
ইতিহাসে যথোপযুক্ত সম্মান পায় নি। সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে এ তত্ত্বের
বিশেষ কয়েকটি অংশের উপর এতকাল ধরে জোর দিয়ে আসা হয়েছে। ফলে
মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের গতিটা হয়েছে সমতাবিহীন।

মনে রাখা দরকার যে মার্কসবাদ একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন।
সুনিপুণ হাতে বোনা বস্ত্রের মতো তার প্রতিটি গ্রন্থি পরস্পরের সঙ্গে বয়ন
করা। এ সত্যটি বিস্মৃত হয়ে ক্রমাগত একটি গ্রন্থির উপর যদি
অত্যধিক চাপ দেওয়া হয়, তাহলে বাকিগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র
ছিন্ন হবে এবং মার্কসবাদ বিদীর্ণ বস্ত্ররূপে দরিদ্রবুদ্ধির বসন হয়ে দাঁড়াবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের প্রয়োগ

এ অসম ক্রমবিকাশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সোভিয়েত ইউনিয়নে
মার্কসবাদের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা। সে দেশে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষার প্রতিটি

সাফল্য বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদীদের যেমন উৎসাহিত করেছে ঠিক তেমনই তার
যাত্রাপথের পদস্খলন তাদের মর্মাহত ও বিভ্রান্ত করেছে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির গত বিংশতিতম কংগ্রেসে এই বিচ্যুতি প্রসঙ্গে
আত্মসমালোচনার ও ত্রুটি-সংশোধনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু
সমালোচনার কায়দা ও সংশোধনের পদ্ধতি লক্ষ্য করে তখনই সন্দেহ হয়েছিল
সমস্যাটার প্রবেশদ্বারের অর্গলে এখনও আঘাত পড়ে নি। সেই কংগ্রেসের পর
আরও কয়েক বৎসর কেটে গেছে এবং পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা প্রারম্ভিক
সন্দেহকে ক্রমশই বলবতী করছে।

প্রতিটি সমাজেই মানুষের অগ্রগতি বা অধোগতির সূত্র আবিষ্কারের
চেষ্টায় মার্কসবাদীরা সর্বপ্রথমেই তার রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন।
অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিগত যুগের অনাচারের কারণ
অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ মাত্র একজন নেতার
স্বৈরতান্ত্রিক আচরণকেই লক্ষ্যবস্তু করে আত্মসন্তুষ্ট হয়েছেন। সমগ্র সমাজ-
ব্যবস্থার কতখানি দায়িত্ব ছিল, সে জটিল অথচ প্রয়োজনীয় সমস্যার আলোচনায়
আজ পর্যন্ত সাহসী হতে পারেন নি।

হলে হয়তো অতীতের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নের অসম্পূর্ণতা বহুলাংশে
পূরণ হত এবং বর্তমানের বিভ্রান্তিকর অসঙ্গতির কিছুটা অবসান হত।
কারণ সোভিয়েতের দুঃখজনক বিচ্যুতির নেপথ্যে ধনতন্ত্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের
দায়িত্বকে এবং অন্যান্য বহিঃস্থ কারণগুলিকে লাঘব না করেও, আজ
স্বীকার করতে হবে যে, অতীতের অগণতান্ত্রিক আচরণবিধির এবং
বর্তমানের বৈকল্যের একটা প্রধান সূত্র রয়ে গেছে সে'দেশের সমাজব্যবস্থার
কাঠামোর কোনো এক কীটদষ্ট ছিদ্রে। বিচার করলে দেখা যাবে যে,
এ-সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মার্কসবাদের প্রয়োগকালে তার তত্ত্বের কিছু
অংশের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ এবং কিছুর প্রতি প্রায় সম্পূর্ণ
ঔদাসীন্য—এই অসমতল ভিত্তির উপর। এরই ফলে অতীতে সোভিয়েত
সমাজের অসামান্য অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অসহনশীলতার রক্তাক্ত প্রকাশ
আমাদের সংশয়গ্রস্ত করেছিল। আজও ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের
নীতি যেমন বিশ্বের মানবতাবাদীদের সমাদর লাভ করেছে, ঠিক তেমনই স্বদেশে
নিঃস্তালিনিকরণের উগ্র তাণ্ডব ও শিল্পী সাহিত্যিকদের স্বাধীন মত প্রকাশে
অশালীন ও উদ্ধত হস্তক্ষেপ মার্কসবাদীদের বিমূঢ় করেছে।

রাশিয়ায় মার্কসবাদের অসঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগের শুরু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গোড়া থেকেই। মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট লীগ ও পরবর্তী যুগে ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে যে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, রাশিয়াতে মার্কসবাদী সংগঠন স্থাপনের সংগ্রামে ও তার গণতন্ত্র রচনায় সে দৃষ্টিভঙ্গি নানা কারণে সম্ভব হয় নি। নিঃসন্দেহে প্রাগ্-বিপ্লবকালীন রাশিয়ায় জারতন্ত্রের একনায়কত্বের জন্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটা গুপ্ত-ষাড়যান্ত্রিক চরিত্র নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু এই চরিত্রকেই আদর্শরূপে বজায় রাখবার প্রচেষ্টায় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব কম নয়। লেনিনের নেতৃত্বে যে সম্পূর্ণ 'নতুন ধরনের দল' তৈরি হয়েছিল, সেই বলশেভিক পার্টির ভিতর অনমনীয় অনুশাসনের ফলে মার্কসবাদের মূল মানবতাবাদী দিকটি এবং ব্যক্তিমানবের অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ক্রমশই অবহেলিত হতে হতে পরবর্তী যুগে প্রায় অবলুপ্তির শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার উৎসাহে ও ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার রূপে পার্টিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাকে কেন্দ্রীকরণের শৃঙ্খলায় শক্ত করতে গিয়ে রুশ মার্কসবাদীরা বিস্মৃত হয়েছিলেন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র সেই কথাগুলি: "বর্তমানের আন্দোলনেও কমিউনিস্টরা সে আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে প্রতিফলিত এবং তার তত্ত্বাবধান করে।"

লেনিনের উগ্র অতি-কেন্দ্রীকরণের বিপদ সম্বন্ধে রুশ বিপ্লবেরও বহু পূর্বে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বলশেভিক পার্টির সদ্যপ্রস্তুত গঠনপ্রণালীর তিনি বিরোধিতা করেছিলেন ১৯০৪ সালে 'ইস্ক্রা'তে প্রকাশিত 'রুশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সাংগঠনিক প্রশ্নাবলী' প্রবন্ধে: "Nothing will more surely enslave a young labour movement to an intellectual elite hungry for power than this bureaucratic strait-jacket, which will immobilize the movement and turn it into an automaton manipulated by a Central Committee," গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করেছে।

রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পর রোজা লুক্সেমবুর্গ তাকে উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে থেকেই মার্কসীয় তত্ত্বের যে বিকৃত ও

অসমঞ্জস প্রয়োগপ্রণালী রাশিয়ায় শুরু হয়েছিল, সেই প্রবণতারই জের বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধিত হতে দেখে তিনি পুনরায় তার বিরোধিতা করতে বাধ্য হন। কোনো অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের সমৃদ্ধিশীল ও সুখী সাম্যবাদ রচনার কল্পনায় বিভোর হয়ে আপাতত সমস্ত মানবিক স্বাধিকারের প্রশ্ন মুলতুবী রেখে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রয়োজনের জন্য তদানীন্তন রুশ নেতৃবৃন্দ যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তা তিনি মানতে পারেন নি। ১৯১৭/১৮ সালে জার্মান কারাগারে বসে রোজা লুক্সেমবুর্গ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক অধিকার বিলোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন: "But socialist democracy is not something which begins only in the promised land after the foundations of socialist economy are created; it does not come as some sort of Christmas present for the worthy people who, in the interim, have loyally supported a handful of socialist dictators. Socialist democracy begins simultaneously with the beginnings of the destruction of the class rule and of the construction of socialism." (*The Russian Revolution*)

মৃত্যুর পূর্বে লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন রাশিয়ায় মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগের অসম্পূর্ণতা ও অসুবিধার কথা। তাঁর শেষ লেখায় এইজন্য বার বার উল্লিখিত হয়েছে পার্টি আমলাতন্ত্রের ঘনায়মান বিপদের কথা, অনগ্রসর রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলশ্রুতি রক্ষার সমস্যা ও শ্রমজীবী সাধারণকে নিজস্ব চিন্তাশক্তির উন্মেষের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত করার কর্তব্য।

বিপ্লবের পূর্বে মার্কসবাদকে যেমন কেবলমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দর্শনরূপেই ব্যবহার করা হয়েছিল, বিপ্লবের পরে তাকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনার হাতিয়ার হিসেবে দেখা হতে লাগল। রাশিয়ার পশ্চাদ্বর্তী অর্থনীতিকে দ্রুতবেগে উন্নত করে ধনতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক শক্তিকে অতিক্রম করার প্রয়োজনের দিকে সমস্ত দৃষ্টি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হল। আজও এ দৌড়-প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে নি। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদ মূলত একটি অর্থনৈতিক বিজ্ঞানরূপেই বেশি স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। মার্কসবাদের সর্বব্যাপী দর্শনের অন্যান্য দিকগুলি অপেক্ষাকৃত অবহেলিত।

মানবীয় কর্মশক্তি: উপায় না অভিপ্রায়?

জীবনের প্রারম্ভে রচিত 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিতে' মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলেছিলেন, মানুষের কর্মক্ষমতাকে কেবল তার জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার উপায়রূপে ব্যবহার করা হয়। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর শেষ জীবনের লেখা 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডে মার্কস যে সাম্যবাদী সমাজের কথা বলেছিলেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে এই—কর্মদক্ষতাকে নিছক উপায়ের স্তর থেকে উন্নীত করে তাকে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে শ্রমশক্তি যে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যয়িত হয়, সেই সময়কাল সংক্ষেপিত করতে পারলেই এই কর্মশক্তির স্বাধীন প্রসার সম্ভব।

দুর্ভাগ্যবশত সোভিয়েত ইউনিয়নে আজও জনসাধারণের কর্মশক্তিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রাচুর্যলাভের পন্থা হিসেবেই ব্যবহৃত করা হচ্ছে। এই প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে সোভিয়েতের মানুষ তার চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলি বিকশিত করার সুযোগ কবে পাবে, সে বিষয়েও আজ সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ দ্বিধাগ্রস্ত। সম্প্রতি 'প্রাভদা' দাবি করেছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই ঐতিহাসিক মন্ত্র "each according to his needs" আজ অতীতাশ্রয়ী অপ্রচলিত। সুতরাং জনসাধারণকে শেখাতে হবে শক্তিশালী যন্ত্র-সমৃদ্ধ ভিত্তি স্থাপনের জন্য তাদের সম্পূর্ণ কর্মশক্তি নিয়োগ করতে। (স্টেট্‌স্‌ম্যান, আগস্ট ২৫, ১৯৬৩)

অথচ মার্কস যে সমাজতন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তা শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের পরাকাষ্ঠার চিত্র নয়। সে-সমাজতন্ত্রের মানুষ তার সমস্ত মানবীয় দিকের পূর্ণ প্রসারের সুযোগ পাবে, যে-সুযোগ থেকে সে ধনতন্ত্রে বঞ্চিত। পাশ্চাত্ত্য সমাজের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যে পরিপুষ্ট মানুষের থেকে সমাজতন্ত্রের মানুষের পার্থক্য এইখানেই। নিজস্ব মোটরগাড়ি বা ঘরে টেলিভিশন আনার ক্ষমতা অর্জনই যদি সমাজতান্ত্রিক মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিশ বৎসর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সঙ্গে কি তার কোনো মানসিক মৌলিক তফাৎ থাকবে?

মার্কসবাদের মূল উদ্দেশ্য শ্রমজীবীদের আর্থিক উন্নতি সাধন—এই জাতীয় একটা অতিসরলীকরণের চিন্তা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ক্রমশই স্থান পাচ্ছে। এর ফলে, ইংলণ্ডে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট্' বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'জনগণের ধনতন্ত্র'

ইত্যাদির নামে শ্রমজীবীদের একটা অংশকে কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছল্যের পরিবেশে যখন এনে দেওয়া হয়, আমরা তখন সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে এর তুলনা করে কেবল একটা কথারই পুনরাবৃত্তি করি। বলি যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এ স্বচ্ছলতা চিরস্থায়ী হবে না, তার অর্থনৈতিক সংকট আসন্ন। ভুলে যাই যে ধনতন্ত্রের স্বল্প-সংখ্যার অস্থায়ী স্বাচ্ছল্যের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের পার্থক্য আরও মৌলিক। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য শ্রমজীবী সমাজের কিছুকে আর্থিক প্রাচুর্যের উৎকোচ দিয়ে আত্মসন্তুষ্ট ও চিন্তাশূন্য করে রাখা। অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদের চিন্তাশক্তির উন্মেষ সাধন ও তাদের মানবীয় অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

বোধহয় এই কর্তব্যে গত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরাঙ্মুখ হবার ফলেই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে সোবিয়েত ইউনিয়নে এক জাতীয় নির্মননশীল অর্থ-উপার্জনসর্বস্ব মানসিকতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নে একাগ্রতার ফলে নিঃসন্দেহে সে দেশে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ঘুচেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্যাতিত জাতির বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের নতুন মানুষ, যে মানুষ মার্কসের ভাষায়, "সম্পত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব মানবীয় সত্তাকে ফিরে পাবে" (*Economic and Philosophic Manuscripts*, 1844), সে মানুষের আবির্ভাবের সাড়া কোথায়?

বিস্মিত ও ব্যথিত হই যখন দেখি আধুনিক চিন্তাজগতের বিতর্কমূলক সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, এ দেশের নিকৃষ্ট হিন্দী চলচ্চিত্র দেখে সোভিয়েত জনসাধারণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। স্পুটনিকের উর্ধ্বাকাশ যাত্রার গুরুত্বকে লাঘব না করেও ভেবে দেখা দরকার ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থটি: "Is it really more important to reach the moon than to understand the heart of the man living in the next street?" ব্যক্তিমানবের বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষণ এবং তাকে নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাই স্তালিন-পূজা, নিঃস্তালিনিকরণ এবং বর্তমানের ক্রুশ্চভ-প্রশস্তি—এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিল আবর্তে সোভিয়েতের মানুষের প্রতিক্রিয়া এক চিন্তাশূন্য নীরবতার আড়ালে আত্মগোপন করে

রইল, সরকারী অনুমোদিত পথে, যখন যেদিকে স্রোত বইছে, তাতে গা ভাসিয়ে দেওয়া তাই এত সহজ।

আসলে মার্কস্‌বাদের দুর্ভাগ্য যে অনগ্রসর মানসিকতাসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে তাকে সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে এই বিদগ্ধ চিন্তা-প্রসূত তত্ত্বটিকে অতিসরলীকরণ করতে হয়েছে। ফলে মার্কসবাদের এই শিশুপাঠ্য তরলীকৃত সংস্করণ, তার সমালোচদের কাছে কুসংস্কার এবং সমর্থকদের কাছে জপমালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোভাব, দিয়ে বাস্তবের বিচার তাই আজও অনুপস্থিত।

জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিকতাবোধ

মার্কসবাদের অসম ক্রমবিকাশে সর্বাধিক পীড়িত হয়েছে, গত অর্ধশতাব্দীকাল-ব্যাপী, মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকটি।

ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর মধ্যে মরুদ্যানের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকাশ নানা ধরনের জটিল ও নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল যার সঙ্গে জড়িত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রয়োজনের সংঘাত। যতই বলা হোক না কেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থরক্ষাই বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবে, এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, অনেক সময়ই আমরা যাকে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে বিরাট অবদান বা পদক্ষেপ বলে অভিনন্দন জানিয়েছি, তা অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় সাময়িক নীতি-কৌশল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

গত যুদ্ধের পূর্বে নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি এই জাতীয় একটি কূটনৈতিক কৌশল মাত্র। অথচ সোভিয়েত-জার্মান সম্পর্কের আঁকা-বাঁকা গতির সঙ্গে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিরা তাল রেখে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে নিজেদের দেশের জন-আন্দোলনের গতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েও, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রয়োজন থেকে বিশ্বের এবং নিজেদের দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার দরকার ছিল। মনে রাখা আবশ্যক, সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন্‌ পদক্ষেপ বাস্তবিকই বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে সাহায্যকারী এবং কোন্‌টি তার নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সাময়িক নীতি-কৌশল মাত্র।

কারণ, সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী বহিঃশত্রু এবং আত্মঘাতী প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে বাঁচাবার কর্তব্যে রুশ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র বিশ্বের শ্রমজীবী সমাজের বিপ্লবের ভরসায় স্বভাবতঃই অপেক্ষা করতে পারেন নি; ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আপস-নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হয়েছেন।

জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে সোভিয়েতের এই জাতীয় কৌশল অবলম্বন সম্বন্ধে কারুর কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন, কমিন্টার্ণ এবং কমিনফর্মে, নিজেদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে রুশ নেতৃবৃন্দ এই সব কৌশল বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর চাপিয়ে দিয়ে অন্যদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিকে নিজেদের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মার্কস্‌বাদী সংগঠনকে নানা সময় কি ভাবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রে পরিণত করা হয়েছিল, তার আংশিক স্বীকৃতি ক্রুশ্চভের বিংশতিতম কংগ্রেসের বক্তৃতায় আছে।

এর থেকে বার বার এইটেই প্রমাণিত হয় যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্বের নির্দেশের প্রতি সরল বিশ্বাসের উপরই সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে এসেছে। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে যুক্তি-নির্ভরশীল সূক্ষ্মদর্শী বিচারক্ষমতাকে কোনোদিনই উৎসাহিত করা হয় নি।

এ অবস্থার অবসান আজও হয়েছে কিনা সন্দেহ। হলে চীন-সোভিয়েতের নিছক জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষমতার লড়াইকে উপলক্ষ করে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এত দ্রুত ও উগ্রভাবে যে যার প্রয়োজন মতো দুই দেশের যে কোনো একটি নেতৃত্বকে অমোঘ সত্যরূপে বেছে নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে পারত না।

চীন-সোভিয়েত বিরোধ

আবেগমুক্ত হয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আন্তর্জাতিকাবাদ-বিরোধী যে জের সোভিয়েত নীতিতে গত চল্লিশ বৎসরে নানা সময় প্রতিফলিত হয়েছিল, তারই চরম পরিণতি আজ পাওয়া যাচ্ছে চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টির আচার-ব্যবহারে।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যে-রকম রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ ও

আন্তর্জাতিকতাবোধের পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থানের ফলে, দুই দেশের অসম রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ ও তাদের দুই ধরনের প্রয়োজন, চীন ও সোভিয়েতের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ও জটিলতর সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিকতাবাদের মার্কসীয় ভিত্তিতে কমিণ্টার্নের যুগ থেকে যে চিড় ধরতে শুরু করেছিল, আজ তা ক্রমবিস্তীর্ণ ফাটলের রূপ নিচ্ছে।

ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে যে, সোবিয়েতের বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগ মূলত জাতীয় স্বার্থসম্বন্ধীয়। চীনের অর্থনীতি ও শিল্প-উন্নয়নের কাজে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যদানের গতিতে ভাঁটা পড়ার বিরুদ্ধে চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিবাদমুখর। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিচালনা-পদ্ধতি নিয়ে চৈনিক পার্টির যে জঙ্গীবাদী তত্ত্ব, তারও পটভূমিকায় রয়েছে স্বদেশ সম্বন্ধে চীনের জাত্যাভিমান, এবং বহির্বিশ্বের ঘটনার গতির সঙ্গে নিজের বিচ্ছিন্নতা। আর পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে চৈনিক মনোভাবও বোধগম্য। যে-পৃথিবীতে ক্ষমতা বিচারের মাপকাঠি পারমাণবিক শক্তির অধিকার ভোগ, যে-যুগে নিজের স্বার্থানুযায়ী কার্য হাসিল করা যায় পারমাণবিক শক্তির ভয় দেখিয়ে, সে পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ শক্তির হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের একচেটিয়া কেন্দ্রীকরণকে কোনো ক্ষুদ্র শক্তিই সন্তুষ্টির চোখে দেখতে পারে না।

এই বিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিষ্পাপ বলিরূপে চুনকাম করার যে চেষ্টা চলছে, তা কোন মতেই সমর্থনীয় নয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে যে-ভাবে দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার করেছে, সে কলঙ্কময় ইতিহাসের ঘা আজও শুকোয় নি। এ-ইতিহাসের নায়কেরা হয় মৃত নয় পদচ্যুত। কিন্তু ভোলা কঠিন, বর্তমানে যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন, এঁরা সেই বিগত যুগের স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্বের হয় সক্রিয় অনুচর ছিলেন কিংবা নীরব দর্শক ছিলেন। সুতরাং আজ যদি এ নেতৃবৃন্দকে কেউ অবিশ্বাসের চোখে দেখে তাহলে সে সন্দেহশীলতা বোধহয় কিছুটা মার্জনীয়।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে এই দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ দূর করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে বলে মনে হয় না। বর্তমান নেতৃত্ব স্তালিন যুগের রক্তাক্ত পদ্ধতির অবসান ঘটানোর ইঙ্গিত দিলেও, অসহনশীলতার প্রবণতা আজও রয়ে গেছে। তাই নিজেদের নীতির সঙ্গে

কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুরুতর মতপার্থক্য ঘটলেই, দেখা যায় সে দেশের প্রতি সোভিয়েত সাহায্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পুরনো প্রতিশ্রুতি বিস্মৃতির গহ্বরে চলে যাচ্ছে।

গত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু নীতি সম্বন্ধে সন্দেহকে, বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টরা গোপন করে রেখেছিল, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে চোখের মণির মতো রক্ষা ও সমর্থনের পবিত্র কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে। এই নীরবতা রচনার পরিকল্পনার ফলে বহু অনাচার ঘটার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। সুতরাং আজ সেই পুরাতন ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করে যাতে ভবিষ্যত অনাচার না ডেকে আনি, তারই জন্য সতর্ক হয়ে সমালোচনা করার সৎসাহস প্রত্যেক কমিউনিস্টের প্রয়োজন।

বিংশতিতম কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে, প্রাথমিক মোহভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার পর, একটা সতেজ আবহাওয়া ও পরিণত চিন্তাশক্তির প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। সোভিয়েত পার্টির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র নীতি গ্রহণ, মার্কসবাদের পুনর্মূল্যায়ন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগের দিকে প্রবণতা এবং অনেকক্ষেত্রে সোভিয়েত পার্টির ভ্রান্তির বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর এই যে সুযোগ পেয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত চৈনিক নীতি সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। চীনের মতান্ধতা, বিবাদপ্রিয়তা এবং সর্বোপরি স্তালিন-যুগীয় অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যাগমনের প্রবণতা, বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে আবার সোভিয়েত পার্টির অন্ধ সমর্থনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। রুশ বিপ্লবের সম্যক মূল্যায়ন এবং সোভিয়েত নীতির আবেগমুক্ত বিচারের যে কাজ শুরু হয়েছিল, তা অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল।

সুতরাং বর্তমানের প্রাথমিক কর্তব্য, কোনো পক্ষের কাছেই বিবেকটা দস্তখত করে না দিয়ে, মার্কসীয় আদর্শের পূর্ণ উপলব্ধি। এবং এ কাজে সবচেয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আশা করা যেতে পারে মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের কাছ থেকেই। বাম বা ডানের প্রতি হেলা বক্ররেখার ভিড়ের মধ্যে সোজা শিরদাঁড়া নিয়ে হাঁটতে সাহসের প্রয়োজন। এ দুঃসাহসিক অভিযানের মন্ত্র হোক দান্তের সেই কথাগুলি, যার উদ্ধৃতি দিয়ে কার্ল মার্কস শেষ করেছিলেন তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এর ভূমিকা :

"Segui il tuo corso, e lascia dir le genti." (লোকে যা-ই বলুক, নিজের পথ অনুসরণ কর)।

সুজয় মিত্র

মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের সমস্যা : অন্য মত

সুমন্তবাবু তাঁর প্রবন্ধে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীতের এবং বর্তমানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় যে কোনো রকম গুরুবাদ চলতে পারে না, কোনো বিশেষ পার্টি বা নেতার নির্দেশ যে মার্কসবাদের শেষ কথা নয়, এ-বিষয় আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তবু সুমন্তবাবুর অনেক সিদ্ধান্ত এবং উক্তি আমার গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না, এমনকি রীতিমতো বিস্ময়কর লেগেছে। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমার যা মনে হয়েছে তা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি।

মার্কসীয় তত্ত্বের কৌলীন্য হরণ

সুমন্তবাবুর মতে, “অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের” (যাঁদের মধ্যে তিনি সোভিয়েত, চীন, এবং বোধহয় অতীতের ও বর্তমানের বেশির ভাগ কমিউনিস্ট নেতাদের ফেলছেন) হাতে পড়ে মার্কসীয় তত্ত্ব এক “বিকলাঙ্গাবস্থা” প্রাপ্ত হয়েছে। সাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বা জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে এই তত্ত্বভাণ্ডার বিক্ষিপ্তভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে, প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে পার্টি বা রাষ্ট্রনেতৃত্বের নিতান্ত স্বার্থপর কৌশলকে বলা হয়েছে মার্কসবাদ প্রয়োগের উজ্জ্বল নিদর্শন। মার্কসবাদকে জনপ্রিয় করতে গিয়ে তার অতি-সরল ব্যাখ্যা প্রচার করা হয়েছে। এ-সবের ফলে মার্কসবাদ আজ তার “কৌলীন্য” হারিয়ে ফেলেছে।

এই অভিযোগের মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর চোখে যাকে অতি-সরলীকরণ মনে হতে পারে, ঐতিহাসিক বিচারে তা কি কিছুটা পরিমাণে স্বাভাবিক বা এমনকি অবশ্যম্ভাবী ছিল না? মার্কসবাদ যত্ন করে সাজিয়ে-রাখা তত্ত্ব-ভাণ্ডার নয়, এই ধূলিমাখা পৃথিবীর আমূল রূপান্তরই ছিল মার্কসের ব্রত, তাই তত্ত্ব এবং শ্রমিক আন্দোলনের

মিলন গোড়ার থেকে হয় মার্কসবাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ের অর্থই হল যা ছিল এতদিন মোটামুটি বুদ্ধিজীবীদের সম্পত্তি, দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে সেই সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ব্যাপকতম প্রসার। পরিমাণগত প্রসারের ফলে তত্ত্বের পবিত্রতা যে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, মার্কসের মতো মহাপুরুষের কাছে তা নিশ্চয়ই অজানা ছিল না। “অন্ধ জনতা”র সংস্পর্শে পাছে দর্শনের শুভ্রতা মসীলিপ্ত হয়ে যায়, সেই ভয়ে ব্রুনো বাউয়ের (তরুণ হেগেলিয়ানদের মধ্যে একজন) রাজনীতি সযত্নে পরিহার করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। গজদন্তমিনারবাসী এই 'Pure Critic'-এর নির্দয় সমালোচনা রয়েছে মার্কসের *Holy Family*-র পাতায় পাতায়।

গণ-আন্দোলনে অতি-সরলীকরণ কিছুটা হয়তো অবশ্যম্ভাবী, তবে বেশি মাত্রায় হলে সেটা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। আন্তনিও গ্রামচী তাঁর *Modern Prince* নামক গ্রন্থে এই সমস্যার কিছু আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু বেশির ভাগ মার্কসীয় নেতা যে এ-বিপদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারেন নি, এ বিষয় আমি সুমন্তবাবুর সঙ্গে একমত। প্রসঙ্গত বলা চলে যে মার্কসবাদের অতি-সরলীকরণ বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও সম্ভব। মার্কসের ১৮৪৪-এর লেখা (পরবর্তী জীবনে তিনি কিন্তু এ-লেখা ছাপান নি) তাঁর মতামতের উপর উজ্জ্বল আলো ফেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর পরের চল্লিশ বছরের রচনায় নানা অবস্থায় নানা সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা অগ্রাহ্য করলে চলে না। কোনও দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক পরিচয় মনে না রাখাটাই অতি-সরলীকরণ।

সোভিয়েত দেশে মার্কসবাদের প্রয়োগ

সাময়িক প্রয়োজনে মার্কসীয় তত্ত্বের অপব্যবহারের প্রধান উদাহরণগুলি সুমন্তবাবু দিয়েছেন সোভিয়েত পার্টির ইতিহাস থেকে। তাঁর মতে রাশিয়ায় মার্কসবাদকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রথমদিকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের দর্শনরূপে, পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে—ফলে যে উচ্চতম মানবিক মূল্যবোধ মার্কসবাদের প্রাণ, তা সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকেও সোভিয়েত নেতারা মোটামুটি রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। বিংশ কংগ্রেসে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি শোধরানোর একটা চেষ্টা হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-চেষ্টার মধ্যে বহু

ক্রটি থেকে যায় (বিশেষ করে স্তালিন এবং স্তালিন-যুগের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অভাব), ফলে সোভিয়েত সমাজ ও তার নেতৃত্বের দুর্বলতাগুলি বহুল পরিমাণে আজও দূর করা যায় নি।

বিংশ কংগ্রেসের কথাই প্রথমে আলোচনা করা যাক। স্তালিন এবং স্তালিন-যুগের পূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বা এ-বিষয়ে শেষ কথা যে বিংশ বা দ্বাবিংশ কংগ্রেস দিতে পেরেছে, তা আমি মনে করি না। কিন্তু স্তালিনকে বিচার করতে হলে যেমন তাঁর যুগটার সম্যক পর্যালোচনা দরকার, তেমনি বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্বের স্তালিন-পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রীতি কোনো কোনো সময় কিছুটা অমার্জিত ঠেকলেও তাঁদের পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থার কথাও আমাদের মনে রাখা কর্তব্য। মূর্তিপূজার পরে মূর্তি-ভাঙ্গার তাণ্ডব অস্বাভাবিক বা ইতিহাসে অভূতপূর্ব নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইতিহাসের পুনর্লিখনের রীতি (যা স্তালিন আরম্ভ করেছিলেন ট্রট্স্কীকে নিয়ে) একদিনে বদলানো কঠিন—তাই স্তালিনের সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন দেওয়া বিংশ কংগ্রেসের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। দ্বিতীয়ত, সুমন্তবাবুর প্রবন্ধ পড়ে মনে হল তিনি বিংশ কংগ্রেসের পরবর্তী সোভিয়েত সমাজের নেতিবাচক, অতিতাশ্রয়ী দিকগুলিই বড়ো বেশি করে দেখছেন, নানা জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পূর্ণতর গণতন্ত্র ও সামগ্রিক সজীবতার যে-সমস্ত লক্ষণ চীন বাদে প্রায় সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে কম-বেশি দেখা যাচ্ছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। শিল্প-সাহিত্যে তথাকথিত 'বুর্জোয়া' ভাবধারার বিরুদ্ধে গত বছরের অভিযান সুমন্তবাবুর মতো আমাকেও বিস্মিত ও পীড়িত করেছিল, কিন্তু তাই বলে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক জীবনে যে আবার স্তালিন-যুগীয় বন্ধ্যাতা ফিরে আসছে, তা তো মনে হয় না। বরং সম্প্রতি দেখলাম মার্কিন পত্রিকা 'নিউ ইয়র্ক টাইম্স' ক্রুশ্চেভ-অভিযানের পরেও নতুন ধরনের সোভিয়েত ফিল্ম দেখে কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করেছে। অসহিষ্ণু ব্যবহার, আমলাতান্ত্রিক মূঢ়তা ইত্যাদি সোভিয়েত সমাজের নেতিবাচক দিকগুলির বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ দৃঢ় সমালোচনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে। সে-সমালোচনা আজকাল কিছুটা ফলপ্রসূ হয় বলে মনে হচ্ছে—গত বছর শোনা গিয়েছিল ইতালি ও ফ্রান্সের কমিউনিস্ট মহলের প্রতিবাদ নাকি এরেনবুর্গ-এভতুশেন্কোর বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করার অন্যতম কারণ। গোটা ছবিটা মনে রেখে তবেই কিন্তু সমালোচনা করা উচিত।

সুমন্তবাবুর মতে, সোভিয়েত সমাজের গলদের মূলে রয়েছে লেনিনের "নতুন ধরনের পার্টি" গঠনের নীতি, যার মধ্যে নিহিত আমলাতান্ত্রিক অতি-কেন্দ্রীকরণের বিপদ সম্পর্কে রোজা লুক্সেমবুর্গ বহু পূর্বে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। লুক্সেমবুর্গের মত নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু তাঁর ১৯০৪-এর লেখাটি "অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত" হয়েছে বলে মানতে পারি না, যখন মনে করি বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর গৌরবময় সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক সৃজনশীলতার অসংখ্য নিদর্শনের কথা। লেনিনের পার্টি ছাড়া রুশ বিপ্লব সাফল্যলাভ করতে পারত না, বেশির ভাগ ঐতিহাসিক এমন কথাই বলেন—তার জন্য ই. এইচ. কার-এর মতো পশ্চিমী ঐতিহাসিকও লেনিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দ্বিতীয়ত, পরের যুগের অতি-কেন্দ্রীকরণ ও পার্টি-গণতন্ত্র বিনাশ বোধহয় লেনিন-নীতির ফল নয়, বিশেষ অবস্থার চাপে এবং ব্যক্তিগত কারণে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য করার পরিণতি। লক্ষণীয়, লুক্সেমবুর্গের দ্বিতীয় যে রচনা থেকে অংশবিশেষ সুমন্তবাবু উদ্ধৃত করেছেন, সে-লেখাটি সবটা পড়লে দেখা যায় নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অভাবের জন্য লেখিকা পার্টি-সংগঠন-নীতি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই অধিক দায়ী করেছেন : "It would be demanding something superhuman from Lenin and his comrades if we should expect of than that under such circumstances they should conjure forth the finest democracy, the most exemplary dictatorship of the proletariat, and a flourishing socialist economy.···The Bolsheviks have shown that they are capable of everything that a genuine revolutionary party can contribute within the limits of the historical possibilities. They are not supposed to perform miracles. For a model and faultless proletarian revolution in an isolated land, exhausted by world war, strangled by imperialism, betrayed by the international proletariat, would be a miracle."

অবশ্য একথা ঠিক, রাশিয়ার বিশেষ অবস্থায় অপরিহার্য লেনিনের ধাঁচের পার্টি যে সকল দেশে সকল কালে প্রয়োজনীয়, কমিণ্টার্ন-যুগের

এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ রয়েছে—লুক্সেমবুর্গের সতর্কবাণী এ-দিক দিয়ে বিশেষ করে মূল্যবান। বিংশ কংগ্রেসের পরের যুগে এ নিয়ে সাম্যবাদী মহলে যে আলোচনা হচ্ছে না, তা নয়—উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমাজতন্ত্র শ্রেণী-সংগ্রামবিহীন বলে যে সেখানে একক-পার্টি ব্যবস্থাটাই স্বাভাবিক ফ্রান্স বা ইতালির কমিউনিস্টরা (এমন-কি বহু-নিন্দিত ভারতের পার্টিও তাঁদের অমৃতসর কংগ্রেসে) এই তত্ত্বটি সম্প্রতি অস্বীকার করেছেন।

সোভিয়েত সমাজের বিরুদ্ধে সুমন্তবাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ, সেখানকার সমগ্র চিন্তা ও কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রাচুর্যলাভ, চরিত্রের অন্যান্য দিক বিকশিত করার সুযোগ থেকে নাকি সোভিয়েত মানুষ বঞ্চিত। কিন্তু আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে কিছুটা উন্নাসিক ভাব কী মার্কসবাদ-সম্মত, যে-মার্কসবাদের আদর্শ সমগ্র মানবজাতির এবং বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত দরিদ্রতম শ্রেণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং মুক্তি? বিপ্লবের পর রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া কি অনুচিত ছিল? দ্বিতীয় এবং আরও বড় কথা হল, চল্লিশ বছরে সোভিয়েত দেশে "শুধুই" অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে, এমন কথা ইতিহাস-সম্মত বলে আমার মনে হয় না। সোভিয়েত এশিয়ার পিছিয়ে-পড়া জাতিদের দ্রুত উন্নয়ন, মেয়েদের স্বাধীনতা ও সমান অধিকার প্রদান, সর্বোপরি সেই বিশাল সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার ফলে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে শিক্ষার আলো পৌঁছে গিয়েছিল সুদূর গ্রামে-গ্রামে—রবীন্দ্রনাথ যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন (অর্থনৈতিক প্রাচুর্য তখনো রাশিয়ায় আসেনি)—সুমন্তবাবু কি এসব ভুলে গেলেন? হিন্দী ছবির জনপ্রিয়তা ও বিমূর্ত শিল্প বা আধুনিক কাব্যরীতির অনাদর দেখে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ব্যথিত হন—কিন্তু সোভিয়েত সাংস্কৃতিক জীবনের এটাই কি পূর্ণাঙ্গ চিত্র? সোভিয়েত দেশেই তো শেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের গ্রন্থাবলী অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে, সুদূর সাইবেরিয়ার ক্ষুদ্র শহরে রবার্ট বার্ণসের জন্মবার্ষিকী স্মরণ করা হয় (দ্বিতীয় খবরটি পড়েছিলাম স্টেটসম্যানে তারিখটা মনে নেই)। রাশিয়া দেখে এসে আন্দ্রে জীদ্ বলেছিলেন, বিশ্বের সাংস্কৃতিক সম্পদ এতদিন ছিল যেন এক দেয়াল-দেওয়া অভিজাত বাগান, বলশেভিকরা এই দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে সর্বস্তরের মানুষের সামনে নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। সাংস্কৃতিক জীবনের এই প্রসারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না, যদিও এর ফলে রুচির মান হয়তো কিছুদিনের জন্য কোথাও কোথাও নিচের দিকেই ঝুঁকেছে।

সোভিয়েত সম্বন্ধে সুমন্তবাবুর তৃতীয় এবং শেষ অভিযোগ, সে-দেশের কমিউনিস্ট পার্টি "নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে··· দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার করেছে, সে কলঙ্কময় ইতিহাসের ঘা আজও শুকোয় নি।" এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি? এ-ধরনের অভিযোগ প্রথম করেছিলেন ট্রট্স্কী, তবে তাঁর একটা যুক্তি ছিল, তিনি ভেবেছিলেন এককভাবে সমাজতন্ত্র গড়া যাবে না, দেশে দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়াই তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। সুমন্তবাবু এ যুক্তি মানেন নি, আজকের দিনে এটা মানাও কঠিন। কিন্তু ট্রটস্কীর যুক্তি অস্বীকার করলে একথাও মানতে হয়, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের আর্থিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করা সোভিয়েত পার্টির আন্তর্জাতিক কর্তব্যেরও অংশ ছিল কারণ একমাত্র এই ভাবেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ তার উদাহরণ ও ক্রমবর্ধমান পরাক্রম দ্বারা বিশ্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারত। অর্থাৎ সোভিয়েতের জাতীয় প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনের স্বার্থ, উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকদূর পর্যন্ত একটা সমীকরণ হয়ে গিয়েছিল। দুয়ের মধ্যে বিরোধ যে একেবারে হয়নি তা নয়—এবং সে বিরোধগুলির সময় বিদেশের কমিউনিস্ট পার্টিরা আর-একটু স্বাবলম্বী হতে পারলে শেষ পর্যন্ত হয়তো রাশিয়া এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলন, উভয়েরই মঙ্গল হত। অবশ্য বিশ্বের সমস্ত পার্টি যে সর্বদা মস্কোর ল্যাজ ধরে নেচেছে, এমন কথা ভাবার কোনো কারণ নেই—সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি বলবৎ থাকলেও ফ্রান্স বা যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই নাৎসীদের সাদর অভ্যর্থনা জানায় নি, আর চীনের পার্টি তো অনেক সময়ই নিজের মতো চলেছে। তবু সুমন্তবাবুর সঙ্গে একমত হওয়া যেত, যদি-না তিনি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অধিকতর স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ এই ঢালাও অভিযোগটা না করে বসতেন, যে সোভিয়েত পার্টি শুধু নিজের সংকীর্ণ স্বার্থে চল্লিশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক আন্দোলনকে ব্যবহার করে এসেছে। বিশেষ প্রমাণ তিনি এখানে দেননি, শুধু বলেছেন সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির কথা। এই চুক্তি ইউরোপের প্রগতিশীল আন্দোলনকে বিমূঢ় করেছিল সন্দেহ নেই—তবু মনে রাখা দরকার যে সেদিন রাশিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক এক অবস্থার

সম্মুখীন হয়েছিল, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের হিটলার তোষণনীতির ফলে ফ্যাসি-বিরোধী কূটনৈতিক ফ্রণ্ট গঠনের ছ-বছরের সোভিয়েত চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর, হিটলারের আক্রমণের সামনে সম্পূর্ণ একলা পড়বার একটা সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। আর সেদিন নাৎসীদের আক্রমণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে গেলে ইউরোপ বা পৃথিবীর অন্য কোথাও সমাজবাদ গণতন্ত্র বা জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কতটুকু আশা বাকি থাকত?

চীন-সোভিয়েত বিতর্ক

সাম্প্রতিক চীন-সোভিয়েত বিতর্ক সম্বন্ধে সুমন্তবাবু প্রথমত বলেছেন, চীনের বর্তমান নীতি অনেকাংশে ভ্রান্ত এবং উগ্র জাত্যাভিমান-দোষে দুষ্ট, কিন্তু আকস্মিক বা অভূতপূর্ব নয়, চল্লিশ বছরের আন্তর্জাতিকতাবিরোধী সোভিয়েত নীতিরই ঐতিহ্য চীন আজ তার চরম পরিণতিতে নিয়ে গেছে। তাঁর এই বক্তব্য ইতিহাস-সম্মত বলে স্বীকার করতে পারলাম না। বিপ্লবের পরমুহূর্তে সমস্ত অসম-চুক্তিলব্ধ অধিকার বিসর্জন, ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-স্বীকার, ইত্যাদি লেনিন-যুগের উদারতা ও আদর্শবাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু স্তালিনের সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক দুইটি সিদ্ধান্ত—সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি ও ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ—এগুলির সঙ্গেও কি চীনের পাক-প্রীতি ও ভারত-আক্রমণের তুলনা চলতে পারে? পারমাণবিক পরীক্ষা-বন্ধ চুক্তিতে চীনের আপত্তি "বোধগম্য" বলে সুমন্তবাবু আধা-সমর্থন করেছেন দেখে অবাক হলাম। "ক্ষুদ্র শক্তি" চীন অপেক্ষা দুর্বল দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে—কই এক ফ্রান্স ছাড়া তারা তো কেউ বৃহৎ শক্তির পারমাণবিক আধিপত্যের ভয়ে ভীত হচ্ছে না? সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের পথে একটি ধাপ বলেই তারা চুক্তিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছে—সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে সম্পূর্ণ অন্ধ না হয়ে থাকলে এটাই তো স্বাভাবিক।

বর্তমান বিরোধে সোভিয়েত পার্টিকে সুমন্তবাবু নির্দোষ বলে মানতে রাজি নন—ক্রুশ্চেভ-নেতৃত্ব তাঁর মতে চীন সম্বন্ধে সহনশীলতার অভাব দেখিয়েছে। আমার তো মনে হয় সোভিয়েত নেতারা বরং বেশি মাত্রায় সহিষ্ণু, কমিউনিস্ট ঐক্যের খাতিরে বার বার কিছুটা আপস-প্রবণতাই তাঁরা দেখিয়েছেন। সুমন্তবাবু মনে হয় ১৯৬০-এর দ্বিতীয় ভাগে চীন থেকে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ সরিয়ে আনার ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন—"নিজেদের নীতির সঙ্গে কোনো

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুরুতর মতপার্থক্য ঘটলেই দেখা যায় সে দেশের প্রতি সোভিয়েত সাহায্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।" ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ ছিল না। প্রকাশ্য বাক-বিতণ্ডা এবং অন্যের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চীনারাই প্রথম শুরু করেছিলেন ১৯৬০-এর এপ্রিলে 'লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক' পুস্তিকা সারা পৃথিবীতে প্রচার করে। চীনে কর্মরত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের এই পুস্তিকাটি পড়ানোর চেষ্টা হয়, তাছাড়া তাঁদের প্রতি অনেক সময় অপমানকর ব্যবহার করা হয়—এ বিষয় 'মেনস্ট্রিম' কাগজে সম্প্রতি ভারতীয় এক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। তাছাড়া সুসলভ রিপোর্ট থেকে জানা গেল, এত কাণ্ডের পরেও ১৯৬৩-র শেষের দিকে সোভিয়েত চীনকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্যদানের প্রস্তাব করে, শুধু একটি মাত্র শর্তে—নিজস্ব মত পরিত্যাগ করার দরকার নেই, খালি প্রকাশ্য বিতর্ক বন্ধ করো। এর উত্তরে চীনা নেতারা তাঁদের আক্রমণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন—ক্রুশ্চেভ "ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বিভেদপন্থী" এবং তিনি রাশিয়ায় ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন এই ধরনের কুৎসা প্রচার করতেও আজকাল তাঁদের লজ্জা হচ্ছে না।

সুমন্তবাবু সমগ্র বিরোধটাকে দেখছেন "নিছক জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষমতার লড়াই" বলে—তাই প্রকৃত মার্কসবাদীদের এ-সমস্ত নোংরা জিনিস থেকে একটু দূরে থাকাই বুঝি কর্তব্য। বিতর্কের মধ্যে একরকম প্রবেশ না করেই এত সহজে তাঁকে সমস্ত জিনিসটা উড়িয়ে দিতে দেখে আমি বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছি। এভাবে তো স্তালিন-ট্রট্স্কী, লেনিন-কাউটস্কি বা মার্কস-বাকুনিন বিরোধকেও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। চীনা নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক অনেক কার্যকলাপ দেখে অবশ্য এমন সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়, যে তাঁদের কাছে আদর্শগত বিরোধ একটা অজুহাত মাত্র, সোভিয়েতকে হটিয়ে বিশ্ব আন্দোলনের নেতৃত্ব অধিকার করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু পৃথিবীর নানা দেশের অনেক মার্কসবাদী চীনা-নীতি সমর্থন করছেন—তাঁরা সকলেই কি হঠাৎ চীনের জাতীয় স্বার্থের দালাল হয়ে গিয়েছেন? চীনা নেতাদের মনে যাই থাকুক, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, যে কমিউনিস্ট মানসে যা কিছু অতীতাশ্রয়ী, চীনা বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই তাকে আকৃষ্ট করেছে। নতুন যুগে পুরনো ফর্মুলা ব্যবহারের অভ্যাস যাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না, স্তালিনের জায়গায় আর এক পিতৃতুল্য পরম গুরু যাঁদের

প্রয়োজন—তাঁরাই ঝুঁকেছেন চীনের দিকে। তথাকথিত সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গিও আবার ক্রুশ্চেভের নিজস্ব সম্পত্তি নয়—বিংশ কংগ্রেসের সৃজনশীল মার্কসবাদের ধারা যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, চীনা মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁদেরই দাঁড়াতে হচ্ছে। কাজেই বিরোধটা শুধু সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে নয়, বর্তমান বিতর্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সমগ্র মার্কসবাদী আন্দোলনেরই ভবিষ্যৎ।

সুমন্তবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, চীন-সোভিয়েত বিরোধ বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আবার অন্ধ সোভিয়েত-আনুগত্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বিংশ কংগ্রেসের স্বাধীন চিন্তার ধারা হারিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরের ঘটনা কিন্তু এর সাক্ষ্য দেয় না। বরং গোঁড়ামির বিষময় ফল চীনের নীতি আরও সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে, মাও ৎসে তুং যাকে "নেতিবাচক উদাহরণ" বলতে ভালোবাসেন, ভাগ্যের পরিহাসে সেই রকম উদাহরণ তাঁর পার্টি আমাদের দিচ্ছে। তা ছাড়া যুগোশ্লাভ, পোল্যাণ্ড, ইতালির মতো পার্টি—যাদের সৃজনশীল তত্ত্ব-আলোচনা ও কার্যক্রম বেশ কিছুদিন থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তারা কেউই নিশ্চয়ই "বিবেক দস্তখত" দিয়ে ক্রুশ্চেভকে সমর্থন করছে না, প্রয়োজন হলে সোভিয়েতের সঙ্গে তাদের মত-পার্থক্যের কথা জানিয়ে দিতে তারা যথেষ্ট প্রস্তুত। দ্বাবিংশ কংগ্রেসের কয়েকটি দিক তোগলিয়াত্তি (এবং ভারতের অজয় ঘোষও) সমালোচনা করেছিলেন, রোম ও প্যারিসের মার্কসবাদী মহলে গত বছরের আধুনিক শিল্পীদের বিরুদ্ধে অভিযান নিন্দিত হয়, অতি সাম্প্রতিককালে আর এক বিশ্ব কমিউনিস্ট অধিবেশনে ডাকার সোভিয়েত প্রস্তাব ইতালিয়ানরা সমর্থন করেন নি, রুমানিয়া আজকাল অনেকটা নিজের মতো চলেছে। অন্ধ আনুগত্যের অবশ্য আজও অভাব দেখছি না পিকিংএর সমর্থকদের মধ্যে—কিন্তু অন্য দিকে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সৃজনশীল মার্কসবাদের অভিযান স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দেশের অবস্থা অনুযায়ী নানা পথে চলেছে, বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হচ্ছে মার্কসবাদের নতুন দিগন্ত।

পাঠকদের আমরা এ-আলোচনায় যোগ দিতে আহ্বান করছি। তবে পরিচয়-এর কলেবরের কথা স্মরণ করে তাঁরা যেন তাঁদের রচনা দু-তিন পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।

—সম্পাদক **পরিচয়**

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুব্রত শান্তনুর কাছে আবার গিয়েছিল।

শান্তনু ভেবেছিল বুঝি সুব্রত রুচির বিষয় বলতেই এসেছে। মুখে হাসি টেনে সুব্রতকে সে অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্তু সুব্রত যখন বললে—শান্তনু তোমার কথাই কদিন থেকে বেশি করে মনে পড়ছে। তখনই শান্তনু কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

না—শান্তনু আর তার বিষয়ে কাউকে ভাবতে দেবে না। এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটেছে। শান্তনুর বাসায় মমতা এসেছিল। মমতা জিজ্ঞাসা করেছিল—অনেকদিন যান নি, কেন? শান্তনু বলেছিল কারণটা। মমতা চুপ করে বসেছিল। ফর্সা রং রৌদ্রে লাল। ঘাম জমেছে ঠোঁটে। খানিকক্ষণ বাদে মমতা জিজ্ঞাসা করেছিল—সেরে যাবে, কী বলেন? শান্তনু ভারি খুশি হয়েছিল শুনে। সেদিন সারাদিন তার মনে হয়েছিল—হ্যাঁ সেরে যাওয়াই ভালো। সারুক তার অসুখটা।

মমতা বলেছিল—জানেন বেণুটা বড় বাজে হয়ে যাচ্ছে।

—কেন?

—মদ খেতে শিখেছে। সেদিন মাতাল হয়ে দুপুরবেলায় এসে হাজির। চলে যেতে বললাম, হাত ধরে কী কান্না।

—মুশকিল তো।

—ভয়ানক মুশকিল, দু-দিন দোকানে মাল বিলি করল না। আমার খাটুনি সার হল। এমন করলে খদ্দের থাকে?

—আমি কিছু বলব ওকে?

—উঁহু আপনি কিছু বলবেন না, আপনার কথা ও আরো শুনবে না।

শান্তনুর মন অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল।

সুব্রত বলল—তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ ?

—সাঁওতাল পরগণায় কোনো একটা জায়গায়।

—ফিরবে কবে ?

—এখন কী করে বলব ?

—রুচি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

—আমার অসুবিধা হলে আমি গিয়েও দেখা করতে পারি।

সুব্রত যেন অনেক দূর থেকে কথা বলল—না সে জন্য নয়, ও বলছিল ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কার জন্যে ?

—তোমার জন্যে।

—বাঁচলাম।

সুব্রত শান্তনুর বিদ্রূপে বিশেষ মাথা ঘামালো না। বলল—কেন জানি না তোমার চলে যাওয়াটা আমার ভালো লাগছে না।

—মনে হচ্ছে যেন শান্তনু পালাচ্ছে।

—কতকটা তাই বটে।

—কার কাছ থেকে ?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

নিজেরই কাছ থেকে।

—কেন ?

—কিছুর মীমাংসা হল না জীবনে। এ রকম উদ্‌ভ্রান্ততার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে আর পারি না। আমরা কত সহজে সব ভুলে যাই। কত সহজে আপস করে ফেলি।

—পালিয়ে গেলে তার মীমাংসা হবে ?

—না, তা হবে না, কিন্তু আমাকে দেখতে হবে না এলোমেলো উল্টোপাল্টা কথা কাজ চিন্তা। সুখদেবপুর এলাকা থেকে লেফ্‌ট পার্টিগুলো কাকে নমিনেশন দেবার কথা ভাবছে জানো ?

—ডাক্তার মৃগাঙ্কমৌলি সান্যালকে।

—এই সেদিন তিনি প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অভ্যর্থনা সভার সভাপতির ভাষণ পড়ছিলেন, না ?

—হ্যাঁ তাই।

—কাল তাঁকে কংগ্রেস টিকিট দিলে তিনি কংগ্রেসেই যাবেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়াও বিচিত্র হবে না। অথচ তিনি সংযুক্ত বামপন্থীদের প্রার্থী হচ্ছেন। হচ্ছেন না ?

—হচ্ছেন।

—বিনয়কে জানতে ? বিনয় বিয়ে করেছে। পণ পেয়েছ প্রচুর। ফার্নিচারের তালিকা শুনলে তোমার হাই উঠবে। সে পি. এম. পণ নেওয়া আটকালো না কিন্তু। তুমি সুবোধকে বলেছ পার্টির মেম্বারশিপ ড্রপ করতে কেন না সে শেয়ার বাজারে যাতায়াত করছে, বিনয়কে কী বলবে ? কিছু বলবেই কি না কে জানে তা।

সুব্রত জবাব দেবার চেষ্টা করল না। শান্তনু বলল :

—এই রকম সংখ্যাতীত প্রশ্ন রাত্রিবেলা ছারপোকার মতো কামড়ায়। এদেরই হাত থেকে পালাতে চাই। আমি জানি তুমি আমায় কী বলবে—বলবে ভীরু, পলায়ণপ্রবণ। কিন্তু আমি যে আর মেলাতে পারছি না। শুধু ছাড়পত্র খুঁজে খুঁজে জীবন চলে না।

সুব্রত বৃথাই মাথার চুলগুলোর ভিতরে আঙুল চালিয়ে রুক্ষ জটগুলো ছাড়াতে চাইল। ও কি জানে না এ সব কথা—জানে বৈকি। কিন্তু এই জানাকে অজুহাত করে আত্মলোপের সিদ্ধান্ত নেবে কি করে সে ? এই সব দুর্বোধ্য জটিলতার সামনে দাঁড়ালেই সুব্রত আজকাল বেশি করে রুচির কথা ভাবে। রুচি—রুচিকেই তার বেশি প্রয়োজন। সে সময়মতো কেমন স্তব্ধ হতে জানে। জানে যথাকালে মুখর হতে। সে শান্তনুর মতো নয়। কবে কোন শুভক্ষণে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হবে তবে বিপ্লবের রঙিন পথে পা বাড়াব—রুচি এমন পণ্ডিতম্মন্যের মতো কথা কখনো ভাবে না। রুচির স্নিগ্ধ হাতের আঙুলে অনেক বরাভয়।

হয়তো শান্তনুও একা একা হলে এমন কথাই ভাবে।

অনেক বেশি অর্থপূর্ণ নয় কি মমতার বেঁচে থাকার চেষ্টা। একদিন ওদের সেই চায়ের দোকানে মমতার বাবার সঙ্গে শান্তনুর দেখা হয়েছিল। তাঁর সেদিন মত্ততা ছিল না। আর শান্তনু দেখেছিল মদ না খেলে ভদ্রলোক ভারি মিতভাষী, নম্র এবং শান্ত।

—মমতার জন্যে একটা ছেলে খুঁজে দিন না। মেয়েটা বড় ভালো বুঝলেন

কিনা। ও ঠিক ওর মায়ের মতন। এমনিতে ওর মায়ের স্বভাব ছিল ভারি মিঠে। অন্যদিকে যাই হোক।

শান্তনু বলল, আচ্ছা দোব।

মমতার বাবা বললেন—হাতিঘোড়া কিছু না, সাধারণ একটা ছেলে হলেই হবে, ওকে যত্নআত্তি করবে, মোটামুটি যা হয় করে এমন একটি ছেলে।

শান্তনু বললে—নিশ্চয় খোঁজ করবে সে।

শান্তনু কিন্তু খোঁজ করেনি। সে নিজের যাবার আয়োজন করতেই ব্যস্ত রয়েছে। ভেবেছিল একদিন মমতার কাছে যাবে। প্রাণভরে গল্প করে আসবে। কী ভেবে যায় নি আর। বেণু দিনের পর দিন কেমন বুনো হয়ে যাচ্ছে। শান্তনুকে আগে স্যার বলত—এখন মাস্টারবাবু বলে। মমতার কথা বললে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। কাটা কাটা কথা বলে। শান্তনুর এ সব কথা ভাবতে আর ভালো লাগে না। বেণুকে সেও এড়িয়ে চলে।

সেদিন কী হল হঠাৎ ঐ চায়ের দোকানটার সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। দুই ভদ্রলোক নামলেন দুটো হাণ্টার আর হুইপ নিয়ে। একজন সায়েবী পোশাক পরা, অন্য জনের অবাঙালী পোশাক। অত্যন্ত চড়া তাদের মেজাজ। বেণুকে দেখতে পেয়েই কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তারা তাকে গাড়িতে তুলল। এবং আশ্চর্য বেণু কোনো প্রতিবাদ করলে না। ন্যায্য শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছে এমন ভাবে গাড়িতে গিয়ে উঠল। অনেক রাত্রে বেণুকে পাওয়া গেল বি. টি. রোডের ধারে একটা কালভার্টের পাশে—সারা শরীর চাবুকের রক্তাক্ত দাগে ডোরাকাটা। বেণুর মালিকের কাছে শান্তনু শুনেছিল যে ছোঁড়াটার ডানা গজিয়েছে। মেয়ে যোগাড় করে দেবে বলে আগাম টাকা নেয়। পরে তাদের বলে, হল না দাদু পাখি ভেগেছে। কে আর এ নিয়ে হল্লা করে বলুন। কিন্তু সব পার্টি তো সমান নয়। ত্যাঁদোড় পার্টির পাল্লায় পড়েছে—কাঠবিড়ালি বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। মমতা শান্তনুকে বললে—ওর মাথায় ঢুকেছে টাকা করতে হবে। ব্যবসায় নামবে।

—কেন এত তাড়াতাড়ি কিসের ?

—টাকা জমাবে। তারপর বিয়ে করবে।

—বলে তোমাকে এ সব কথা ?

—বলে না আবার, কেবলই বলে।

—আর কিছু বলে ?—আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল শান্তনু। এক লহমায় বিব্রত হয়ে উঠল মমতা—আবার কি বলবে, কি যে বলেন।

মমতার হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মুখখানা দেখে শান্তনু সব বুঝল। আর দেখল মমতা কত বড় হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যটা ফিরেছে। মুখের মধ্যে একটা দৃঢ়-লক্ষ্য প্রত্যয় জেগেছে। সারা শরীরে এসেছে একটা সুঠাম শরীরী লাবণ্য। যাইহোক না কেন, সব কিছু উপেক্ষা করে এবং তুচ্ছ করে মমতা শেষ পর্যন্ত সুন্দর হবে। শান্তনুর মনের এক কোণে একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠল।

—তুমি যে বলছিলে বেণু মদ খেতে শিখেছে।—শান্তনুর নিজের কাছেই নিজের স্বর কেমন যেন শুকনো বলে মনে হল।

—তাতে কী, মদ তো আমার বাবাও খায়।

মমতার গলা প্রয়োজনের বেশি গম্ভীর।

শান্তনু এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলেনি। বেণুর মতো একটা বাজে ছেলে এবং মমতার মতো একটা ভালো মেয়েকে সে এক করে ভাবতে পারছে না। অথচ সে মন খুলে সব কথা বলতেও পারছে না। মমতা হয়তো ভাববে—না, থাক বলে দরকার নেই কিছু। মমতা কী বুঝল কে জানে। সে বলল—ওর যত দুর্ভোগ সব আমারই জন্যে। কাজেই আমি ওর ভালোমন্দ কিছু বলতে পারি না। বলবও না। আমার জ্বর হলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কেউ বাড়িতে থাকে না। আসেও না খোঁজ নিতে কেউ। ও ছুটে যায়, ডাক্তার নিয়ে আসে, ওষুধ কিনতে ছোটে। টাকা না থাকলে ধার করে। এই করে কাবলিওয়ালার কাছে ওর দেনা জমে গেছে। কিন্তু সেসব তো আমারই জন্যে।

শান্তনু বলল—তা বলে অন্যায় করলে বলবে না।

মমতা হেসে লুটিয়ে পড়ল। বলল—ও তো আমার ওপর অন্যায় করছে না। আমার জন্যে করছে। ধীরে সুস্থে বলব বৈকি সে সব কথা। কিন্তু তাই বলে ওকে কি বাদ দিতে পারি ? ও বাবা, তা হলে ও ঠিক লাইনে গলা দেবে।

শান্তনু ভাবল আমি তো লাইনে গলা দিতে পারব না—কাজেই চুপ করে যাই। বেণু যা পারে নিশ্চয়ই আমি তা পারি না। কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা ধার করতে পারি না, মমতার তৈরি জিনিস দোকানে দোকানে ফেরি করতে পারি না, মমতার বাবা মদ খেয়ে বমি করলে মাথায় জল

চালতে পারি না। বস্তুত আমি কিছুই পারি না। কাজেই চুপ করে যাওয়াই ভালো।

—মমতা,

—বলুন।

—তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে "আপনি খুব ভালো লোক।"

—বলেছিলাম তো।

—আজও তাই বল কি?

—হ্যাঁ তাই বলি। আপনি খুব ভালো লোক।

আজই শান্তনু কথাটার মানে বুঝতে পারল। সেদিন কথাটা নিয়ে মিছেই নাড়াচাড়া করেছে সে। কথাটার মানে বোঝেনি। ও কথার মানে হচ্ছে আপনি খুব ভালো লোক—এর বেশি কিছু নয়।

শান্তনু বুঝল যে সে যেমন অনেক কিছুই পারে না, তেমনি ভালোবাসতেও পারে না। বুঝল পৃথিবীতে অতি তুচ্ছ কাজও সোজা কাজ নয়। আর, সব কাজেই নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। নিজেকেও যাচাই করতে হয়—কতটা খাঁটি, কতটা মেকি। কাজেই ওদিকে আর কথা বাড়াল না শান্তনু।

মমতা জিজ্ঞাসা করল—কবে যাচ্ছেন?

শান্তনু বলল—এই সপ্তাহেই।

—আসছেন কবে?

—কী করে বলব। আসার ইচ্ছে খুব নেই।

—কেন?

—ইচ্ছে করার মতো কিছু নেই বলে।

—মনে করলেই থাকে, মনে না করলেই থাকে না।

সারাটা সন্ধ্যা সেদিন মমতার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখের ঐ একটি বাক্য শান্তনুকে আচ্ছন্ন করে রইল—"মনে করলেই থাকে, মনে না করলেই থাকে না।"

জীবনের দিকে যদি এতই সহজে তাকানো যেত, এতই যদি সোজা করে নেওয়া যেত সব জট তাহলে কোথাও যেতে হত না। শান্তনু কি তা জানে না? জানে বৈকি। কিন্তু ও-ভাবে তাকানোর আর্ট সে কোনোদিন শেখেনি যে। তার চেয়ে এই ভালো এই মেয়েটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে যাওয়া। এ সুখী হোক। বেণু হয়তো আস্তে আস্তে শুধরে যাবে—হয়তো মমতার ছায়ায় ছায়ায় ও একদিন স্নিগ্ধ হয়ে উঠবেও। এখনি বেণুকে দেখে

আতঙ্কিত হয়ে কী লাভ? বর্তমানের কোন্ স্তর কোন্ পর্যায়কে দেখে আশান্বিত হওয়া যায়? কী হচ্ছে এটা বড় কথা নয়, কী হবে, কী হতে পারে—সেটাই আসল কথা। আর সেটা তো একটা এ্যাটিচ্যুডের প্রশ্ন। শান্তনু ভাবল সে এ্যাটিচ্যুড আমার না থাক, এদের থাকল।

শান্তনু আর দেরি করল না। পরের দিন বিকেলে ট্রেনে উঠল। না সুব্রত, না রুচি, না মমতা—অনাত্মীয় জনতায় বোঝাই স্টেশনের দিকে পিছু ফিরে বসে থাকল সে, শেষ ঘণ্টা, শেষ হুইসিল না বাজা পর্যন্ত।

আজ ময়দানে পার্টির আহ্বানে প্রকাশ্য সমাবেশ।

সুপ্রীম কোর্টের রায় বেরিয়েছে অনেকদিন। ভারতীয় কোনো রাজনৈতিক সংস্থাকে ভারতের কোনো অঙ্গরাজে অবৈধ ঘোষণা করা চলবে না। তারপর এই প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশের আহ্বান। ময়দানের পুব দিকে সুব্রত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদিক থেকে একটা বৃহত্তম মিছিল এসে ময়দানে ঢুকছে। অবরুদ্ধ ট্র্যাফিক। দক্ষিণ দিক থেকে আর একটা আসছে। ব্যারাকপুর, বজবজ, এলেনবেরি, বার্মাশেল, জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং, আন্দুলমৌরি, জুট ওয়ার্কাস—মিছিল মিছিল মিছিল—মনুমেন্টের নিচে থেকে মাইক্রোফোনে হেঁকে জানাচ্ছে কারা এল, কোথা থেকে এল। ক্রাচ বগলে পা-কাটা যুবক, হাসি-হাসি মুখ। বই হাতে ছাত্র। রুক্ষ-চুল ইনটেলেকচুয়াল। কবি-শ্রমিক-প্রেমিক। ঘর্মাক্ত এবং কর্মার্ত। সুব্রত দাঁড়িয়ে আছে। নানা রঙের ফেস্টুন। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, বাঁচবার মতো মজুরি চাই, সুব্রতর মনে পড়ে গেল—ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া।

—উঃ কত যে খুঁজেছি, দেরি হয়ে গেল। রুচি খুশিতে উপছে পড়ছে ভিড় দেখে।

—এখন এলে?

—হ্যাঁ আমরা আশীজন এলাম যে।

সুব্রত দেখল রুচি ঘামছে—লাল হচ্ছে।

—জানো, শান্তনু চলে গেছে?

—কবে? কিছু বলে গেল না তো।

রুচি দেখল এ শুধু সুব্রতর মন্তব্য, জিজ্ঞাসা নয়। সুব্রত তাকিয়ে আছে পশ্চিমদিকে। জনসমাবেশ সেদিকে জনসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। সমাবেশের

কাজ শুরু হবে। স্বল্প কথায় পতাকা উত্তোলনের ভাষণ শেষ করলেন পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। নোয়াখালির বৃদ্ধ মানুষটির উচ্চারণে আর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল কে কথা বলছেন।—গান শুরু হল—উঠ হোসয়ে…আ বেদার হো যা…

—আমি গিয়েছিলাম শান্তনুর খোঁজে। যদি পাই ধরে নিয়ে আসব বলে। ও এমন লুকিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তুমি আমার কথা শুনছ না।

না, শুনছিল না সুব্রত। ওরা রাস্তার দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সুব্রত দেখছিল একটি সুবেশ প্রৌঢ়ের সঙ্গে একটি সুঠাম তরুণী গাড়িতে ওঠার উদ্যোগ করছে। তরুণীর স্মিত মুখে রকমারি প্রসাধন। প্রৌঢ়ের মুখে আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ।

রুচি জিজ্ঞাসা করল—কী দেখছ?

সুব্রত বলল—ওদের চিনতে পারছ না তুমি?

রুচি একটু তাকিয়ে বলল—নন্দিনী না। সঙ্গে ও কে, প্রিয়ব্রতবাবু নন তো? প্রগলভ হাসি ছড়িয়ে গাড়ি চলে গেল। সুব্রত ওদিকে তাকিয়ে থেকে বলল—না ওঁকে আমরা জানি না। রুচি চুপ করে গেল।

সুব্রত বলল—চলো রুচি, আমরা সবায়ের মধ্যে গিয়ে বসি।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লাল গোলাপের জন্য

আমারও প্রিয় রং লাল;
আমারও প্রিয় ফুল
গোলাপ।

আমি লড়ছি
লাল গোলাপের জন্যে।

চেয়ে দেখ,
আসমুদ্রহিমাচল
শোকস্তব্ধ আমাদের ভালবাসা
নতমুখে
উদ্ভিন্ন মাটির দিকে তাকিয়ে।

শৃঙ্খলের ক্ষতগুলো
ভাল ক'রে আজও শুকোয় নি;
প্রাণের সব তার
এক সুরে এখনও বাঁধা হয় নি;
সর্বনাশের কিনার থেকে
পৃথিবী
বরাবরের মত এখনও সরে আসে নি।

চষা মাটির মত এবড়ো খেবড়ো সময়;
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।
আশাহত অবুঝ অশান্ত
আমাদের আজকের অভিমানগুলো
চোখের জল ফেলে
নবান্নের উৎসব করবে।

চোখে নয়,
এখন আমাদের বুকের মধ্যে লাল গোলাপ—
বুক দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

আমার প্রিয় রং লাল ;
আমার প্রিয় ফুল
গোলাপ।

লাল গোলাপের জন্য
সাহসে বুক বেঁধে
এখন আমাদের লড়াই ॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

কবি, তুমি একবার তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষে ছাখো এসে :
ব্রাহ্মণমহিমা ক্ষত্রগরিমা না, মনুষ্যত্ব মনীষা মমতা
কিছু না—ব্যাপারী রাজা মন্ত্রী ভাঁড়ু দত্ত শুধু বৈশ্যের সভ্যতা
যোজনায় যন্ত্রথর নিয়নে নাইলনে নগ্ন উর্ধ্বশ্বাস দেশে।
কে জানত নিগূঢ় স্কাইস্ক্রেপারে স্ক্রেপারে আদি অরণ্যের গুহা ?
মানুষ দ্বিপদ জন্তু আত্মপর একাকিত্বে নিজেরই পোষা কি
নিজেকে লেহন ক'রে ! সংস্কৃতি যদিও সভাউজ্জ্বল, পোশাকী
ছদ্মবেশ ছিঁড়লে নখীদন্তীশৃঙ্গী লোভ দ্বেষ দর্প বা অসূয়া।

কবি, তুমি নিজ মুখ দেখো না বার্ষিক স্মৃতিতর্পণ-দর্পণে
রবীন্দ্রসঙ্গীত কানে নিয়ো নাক' ইঙ্গবঙ্গ গদ্‌গদ ভাষণ—
আপন প্রতিমা ভেঙে দীপ উল্টে মালা ছিঁড়ে আত্মসমর্পণে
পূর্ণ কর অভ্যুদয়, পূর্ণ কর এতকাল শূন্য যে-আসন।
সভ্যতা-সংকটে ক্ষয়ে এস কবি সংক্রান্তির চণ্ড বিস্ফোরণে
হে বীর, সম্ভব কর ভারতবর্ষে সুন্দরের পুনর্বাসন।

সিদ্ধেশ্বর সেন

মা যেখানে থাকেন

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য.................."

॥ সূক্ত : ৫ ॥ ঈশোপনিষৎ

মা যেখানে থাকেন, সেইখানেই
তো মন্দির

পূজার্চনা শেষ হয়েছে, এখন
গঙ্গাজল

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

এখন তিনি ঘুমোন, আমি
জেগে আছি
শিয়রদেশের পাশে, আমি
রইব জেগে, মা

যেখানে আছেন, সেখানেই
তো মন্দির

হাসপাতাল আর মন্দিরে, কী এতই
মাথামাখি
এই তো থাকেন, মা

এইখানে—তিনি ছিলেন, এই-ই
যেমন পরিপাটি, এই তো, তেমি
আছেন শুয়ে,—আমার

মা-জননী মন্দিরে তাঁর, অ-রোগ
বিছানায়

আমি রয়েছি জেগে, উনি
ঘুমিয়ে আছেন

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

২

স্বস্তি
ফিরুক তাঁর নিশ্বাস
ফিরুক, যা, মাতরিশ্বা
হাওয়া
স্বস্তি

নমো মধু
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত—মধু, মধু

ফিরুক, অন্নময় তাঁরই
প্রাণ—
মনোময় কোষ বিজ্ঞানময়ও
ক্ষিতিতে, অপ ও তেজে
মরুৎ ও ব্যোমে
স্বস্তি
জাতবেদ অগ্নিমুখে—স্বস্তি

স্বপ্নে, স্বপ্নভঙ্গে, প্রয়াণে হে
অলক্ষ্য, অলক্ষ্যযানে
দ্যাব্যাপৃথিবীর থেকে উত্থান, উত্থিত
চরাচর
পঞ্চভূতে-অন্তরীক্ষে-ভূপৃষ্ঠে ও স্রোতবহতায়, ভেসে
অনন্তযাত্রায়······

নির্মলা মা, ফের একাকিনী ; ওম
শান্তিঃ : শান্তিঃ
—মা আমার ॥

জগদীশ ভট্টাচার্য

কাল রাতে

রন্ধ্রহীন অন্ধকারে
মাঝদরিয়ার বুকে হাল ভাঙা নাবিক দেখো নি ?
তাহলে আমার দিকে চাও।
কাল রাতে আমি সেই মৃত্যুভীত নাবিক ছিলাম ॥

আকাশে ছিল না তারা,
সমুদ্রের বুকে ছিল ঝড়।
উত্তাল ঢেউয়ের মুখে তরীখানি ছিল অসহায়।
বিনাশের বিভীষিকা হিংস্র শ্বাপদ হয়ে
আমাকে কবলে পুরেছিল।
বুকে ছিল দিশাহারা দুরুদুরু মৃত্যুর ইশারা।
প্রেতায়িত চেতনায় একটি মুমূর্ষু শিখা
আলেয়ার মতো ছিল জেগে—
কখন তলিয়ে যাব নিঃসীম অতলে।
কখন আসবে নেমে শেষ সর্বনাশ ॥

রন্ধ্রহীন অন্ধকারে
মাঝদরিয়ার বুকে হাল ভাঙা নাবিক দেখো নি ?
তাহলে আমার দিকে চাও।
কাল রাতে আমি সেই মৃত্যুভীত নাবিক ছিলাম ॥

রণজিৎ সিংহ

কবি সমাধিস্থল

এ সমাধিস্থলে শুয়ে আছে আশ্চর্য হৃদয়,
শুয়ে আছ কবি।
নির্জনে আসে না কেউ
কেবল সৌহার্দ্য মেলে ধরে
মাটি ঘাস তারা সকাল সন্ধ্যা।

শহরের একান্তে নির্জনতা পাব ব'লে
চ'লে আসি দুজন ;
এখানে এ সমাধিস্থলে ফোটাব ভালোবাসা।

ও কবি ও সন্ধ্যামৌন হৃদয়!
দিব্য উচ্চারণে
ডাকো ওই তারাদের,
বহাও অমিত জ্যোৎস্না, সৌরভ,
বহাও আশ্চর্য নদীর ধ্বনি……
আমাদের সন্তাপ ধুয়ে যাক
আমাদের হৃদয় গলে যাক রাজকীয় মৌনতায়।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গভীর রাত। সরাইখানার একটি ছোট্ট ঘর, ডানদিকের দেয়ালে দরজা ; সেই দরজার ফাঁক দিয়ে বড় ঘর দেখা যাচ্ছে—সেখানে কয়েকজন লোক বসে মদ্য পান করছে। ঘরের পেছনে দেওয়ালের নিচু দিকে জানলা—জানলা দিয়ে ফুলের লতানো গাছ দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের দেয়ালে ফায়ার প্লেস। ফায়ার প্লেস আর জানলার মাঝখানে নিচু খাট—বিছানা পাতা। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল, তার ওপর মোমবাতি, গ্লাস, মদ ইত্যাদি। তিনজন লোক টেবিলের চারপাশে বসে মদ্য পান করছে। মার্লো জানলার দিকে পেছন ফিরে, একটি পা চেয়ারে রেখে চিৎকার করে গান করছে এমন সময় পর্দা উঠছে।]

মার্লো : এক যে আছে নিয়তি সে ভাগ্য নিয়ে খেলা করে ;
হঠাৎ যদি দেয় সে দেখা, বলব যে তার হাতটি ধরে—
'তোমার সঙ্গে কাটাব দিন—এ সাধ ছিল অন্তবিহীন,
কিন্তু তুমিই ফেরালে মুখ, বাঁধব তোমায় কিসের ডোরে ?'
তুমি আমার পরানসখী
তুমি আমার মাতাল হাওয়া—
তোমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে
হোক না আমার গানটি গাওয়া—

সবাই একসাথে : তুমি আমার প্রাণের খুশি
তুমি আমার সুখের চাওয়া—

তোমার স্বরে সুর মিলিয়ে
হোক না আমার গানটি গাওয়া—।

প্রথম ব্যক্তি : (টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে) আবার ! আবার !

সরাইওয়ালা : (দরজার কাছ থেকে) এই যে মশায় ! বাইরে একজন অল্পবয়স্ক লোক—ঘোড়ায় চড়ে এসেছে—আপনাকে চায়।—

মার্লো : কি নাম তার ?

সরাইওয়ালা : আর্চার, ফ্রান্সিস আর্চার ! বলছে আপনি ওকে চেনেন।

মার্লো : একজন আর্চারকে আমি চিনতাম, কিন্তু সে ফ্লাওয়ার্সে মারা গেছে।

সরাইওয়ালা : লোকটির সারা গায়ে এত কাদা যে ও ফ্লাওয়ার্স থেকে আসতেও পারে।

মার্লো : ফ্লাওয়ার্সের কবর এত কম গভীর ! ওকে বলো বেঁচে থাকলে আমি ওকে চিনি না···আর মরে গেলে ওকে আমি চিনতে চাই না। কাজেই যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যাক ও।

[সরাইওয়ালা বেরিয়ে যায়]

প্রথম ব্যক্তি : কিন্তু ও যদি সত্যিকারের ভূত হয় ? তোমার একটু ভাবা উচিত, তুমিও তো একদিন ভূত হবে। হবে কি না ? তারপরে ভূত হয়ে বন্ধুদের কাছে গেলে তারা তোমায় চিনতে পারল না ! কেমন কষ্টটা পাবে, ভাব দিকিনি।

সরাইওয়ালা : (দরজার কাছ থেকে) লোকটি বলছে, আপনি সত্যিই ওকে চেনেন···আর আপনার সঙ্গে ওর বিশেষ দরকার।

মার্লো : বেশ, আসুক ! তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?
যদি মৃত্যুও আসে এখানে তো গাইব :
আসবে যখন মৃত্যুরাজা নিয়ে কঠিন পরোয়ানা।
অট্টহাসি হেসে তখন দেখব যে তার কাণ্ডখানা ॥
বলব, দাদা যমরাজ হে, আছো তো বেশ খোশ মেজাজে ?
তোমার খেলা চলছে কেমন, করছ কি তায় টালবাহানা ?
যমরাজ গো লক্ষ্মী দাদা,
ঘুচুক তোমার আপদ বালাই,

এখন এসো তোমার সাথে
বোতল নিয়ে ফুর্তি চালাই !

মেরীর কণ্ঠস্বর :

হায় শুনি কী ভীষণ কথা !
যমের সঙ্গে রসিকতা !
ধরবে যখন গলা টিপে
ঘুচবে তোমার ধানাই পানাই ॥

সবাই একসাথে :

যমরাজ গো, লক্ষ্মী দাদা,
জানি তোমার মনটি সাদা,
দোহাই, ছেড়ে দাও আমাদের,
প্রাণটা নিয়ে ঘরে পালাই ॥

মার্লো : এ কার গলা ?

[মেরী দরজা খুলে ভেতরে এসে দাঁড়ায়, পরণে ছেলেদের পোশাক, গায়ে ক্লোক, পায়ে রাইডিং বুট, মাথায় স্লাউচ ক্যাপ]

প্রথম ব্যক্তি : নাইটিংগেলের গলা ! চেন নাকি একে ?

মার্লো : মনে হচ্ছে চিনি। (মেরীকে আড়ালে) একি কাণ্ড ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তুমি নাকি মরে গেছ ?···কবরের মাটির তলায় ছিলে ?

মেরী : তাই তো ছিলাম। কিন্তু লণ্ডনের এক ডাইনী দিনরাত মার্লোর জন্য হাহুতাশ করে ! সে-ই কবর থেকে তুলে আমায় পাঠালে ওকে খুঁজে আনার জন্যে।

প্রথম ব্যক্তি : সেই ডাইনীর নাম ?

মেরী : এত জোরে আমি ছুটেছি ওর খোঁজে যে আমার স্মরণশক্তি পেছনে পড়ে আছে···ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে আর আসবে না।

মার্লো : সরাইওয়ালা ! দশজনের মতো মদ পাশের ঘরে দাও। আর তোমরা ওঘরে গিয়ে ফুর্তি কর।

প্রথম ব্যক্তি : কিচ্ছু ! তুমি চা-লাক ! আমি চা-লাক ! আমরা সব্বাই চা-লাক !

তুমি আমার প্রাণের খুশি
তুমি আমার সুখের চাওয়া—
তোমার সুরে সুর মিলিয়ে
হোক না আমার গানটি গাওয়া—

[ওরা বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়]

মেরী : এত ভালো মেক্‌-আপ দেখেছো কখনো? চুল নিয়েই যা একটু ঝামেলা হয়েছিল!

মার্লো : পাগল! এ সব কি কাণ্ড!

মেরী : পতঙ্গ! তুমি আমার শিখায় পুড়তে চাও না? আমি একা জলছি!—কিট্‌, তুমি চারদিন আমার কাছে আসনি!

মার্লো : অসুবিধে ছিল—যেতে পারি নি।

মেরী : পতঙ্গ তোমার পাখা কী পুড়েছে?

মার্লো : আমি না। পতঙ্গরাজ জলেপুড়ে মরছে তোমার শিখায়।

মেরী : ও, শেক্সপীয়র! আমি পালিয়ে এসেছি—পোড়ার গন্ধ আমি সইতে পারি না! আজ রাতে ওর আমার কাছে আসার কথা ছিল··· ট্র্যাজেডি, কমেডি পড়ে শোনাতে—ওঃ এত ক্লান্তি লাগে!—তুমি আমায় ভালোবাসো? (চুমো খায়)

মার্লো : ইচ্ছের থেকে বেশি।

মেরী : রোগমুক্ত হতে চাও?

মার্লো : সম্ভব নয়।

মেরী : কেন? চার্চে গিয়ে বিয়ে করে ফেল। বিয়ের ফুল ফুটলেই প্রেমের ফুল ঝরে যাবে। উইলও বলে এই কথা।

মার্লো : উইলের জানা উচিত।

মেরী : কি বললে?

মার্লো : কিছু না।

মেরী : ও বিবাহিত?

মার্লো : আমি তো বলিনি সে কথা।

মেরী : বিবাহিত! এর ফল পেতে হবে ওকে। বিবাহিত! আমি একটু সন্দেহ করেছিলাম। আচ্ছা! দেশে আছে ওর স্ত্রী?

মার্লো : দশ বছর ওদের দেখা হয় নি। রোমিও-জুলিয়েটের রাতে উইলকে খবর পাঠিয়েছিল—যাবার জন্য।

মেরী : এখন সব বুঝতে পারছি, আমি! এই জন্যই সে রাতে ও রকম অদ্ভুত ব্যবহার করছিল উইল! আমরা সবাই ঠক্‌ কিন্তু এখন ওকে ঠকাতে আর বিবেকে লাগবে না। বিবাহিত!

মার্লো : এ আমি কি করলাম! মেরী, তুমি জান না উইল আমাকে কতটা বিশ্বাস করে! শিশুর মতো সরল বিশ্বাস নিয়ে ওই আমাকে পাঠিয়েছিল তোমার কাছে—যাতে তোমার কাছে ওর কথা বলি। বন্ধু বলে ও আমায় বিশ্বাস করল···আর কি সুন্দর প্রতিদান আমি দিচ্ছি সেই বিশ্বাসের!

মেরী : ওর কথা বলে কেন সময় নষ্ট করছ? ভুলে যাও এখন ওকে।

মার্লো : তুমি পার?

মেরী : ভুলতে পারি না, তাই তো এত খারাপ লাগে—

মার্লো : ভুলে যাব? ওকে ভোলার চেয়ে আমার নিজেকে ভোলা সহজ! মেরী, আমি ওর স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে ফেলে আসা উদ্দাম যৌবন। মাঝে-মাঝে মনে হয়—আমি যদি হঠাৎ মরে যাই উইলের ভেতর আমি বেঁচে থাকব! ওর লেখার কালিতে আমার রক্ত মিশে থাকবে।

মেরী : অসহ্য, কিট্‌! আমি এত কষ্ট করে এলাম সে কি শুধু মৃত্যুর কথা শুনতে?

মার্লো : তুমিই তো আর্চারের কথা মনে করিয়ে দিলে।

মেরী : তুমি ওর কথা বলেছিলে একদিন—আমি তোমায় চমকে দিতে চেয়েছিলাম।

মার্লো : সেই থেকে আমার মাথায় মৃত্যুর ছায়া ঘুরপাক খাচ্ছে। মৃত্যু··· মৃত্যু কি অসুন্দর!···আমার খুব ভালো লাগছে তুমি এসেছ! আমার সঙ্গে থাক···জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাক···ভুলে যাও সব—শুধু আমার পাশে থাক!

মেরী : (মার্লোর গলা জড়িয়ে ধরে) এমনি করে···সারা রাত···চুপ করে··· তুমি আর আমি···ওকি? কে ডাকে? শুনতে পাচ্ছ কিছু?

মার্লো : পাখি ডাকছে দূরে কোথাও।

মেরী : ঐ আবার ! জানলাটা খোল ! (মার্লো উঠে গিয়ে জানলা খুলে দেয়) কিছু দেখতে পেলে ?

মার্লো : চারপাশ কি আশ্চর্য নিশ্চুপ ! চাঁদ ডুবে গেছে···কি গভীর অন্ধকার !

মেরী : আর বাতাস ! যেন ঈর্ষায় জলে আছড়ে পড়ছে জানলার ওপরে— আমাদের আলাদা করে দিতে চাইছে ঘরে এসে ! কিট্ তোমার ঈর্ষা হয় না ?

মার্লো : অত বোকা আমি নই যে হলেও বলব।

মেরী : হ্যাঁ, তুমি সত্যিই বোকা নও। উইল বলে, ওর ঈর্ষা নেই—কিন্তু যখন ও চুপ করে তাকিয়ে থাকে···ওর দৃষ্টি আমার পেছন পেছন ঘুরতে থাকে···যখন চুমো খেতে খেতে হঠাৎ থমকে গিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে···তখন···তখন···সমস্ত গা-টা যেন শিরশির করে ওঠে···। ভাগ্যিস্ ও তোমায় বন্ধু বলে মনে করে—

মার্লো : আমি ওর বন্ধুই ছিলাম।

[শেক্সপীয়র নিঃশব্দে জানলার কার্নিশে এসে দাঁড়ায়]

মেরী : এখনও তো তুমি ওর বন্ধু—তাই না ? তাই তো বন্ধুর মতো সব জিনিস ভাগ করে নাও। একই প্রেমিকা—দুই বন্ধু মিলে—আঃ ছটফট করো না—ওকি ?—ঠোঁটের কোণে বিরক্তি কেন ? বন্ধুর কথা ভাবছ বুঝি ?

মার্লো : ও কথা যাক। তুমি জান আমি ওকে ভালোবাসতাম—ভালোবাসি।

মেরী : আমিও তো ভালোবাসি।

মার্লো : আচ্ছা, আচ্ছা, আজ রাতে নয়।

শেক্স : (জানলায় দাঁড়িয়ে) আজ রাতে নয় কেন, আমার বন্ধু, আমার প্রেমিকা ?

[ওরা চমকে ওঠে। উইল লাফিয়ে ঘরের ভেতরে আসে]

আমাকে মদ দিয়ে অভ্যর্থনা করবে না তোমরা ? বস, বস—অনেক কথা আছে আমাদের তিনজনের। কিন্তু তার আগে বল তোমার হাত ওর গলায় অমন করে জড়ানো কেন ?—যেন বহু দিনের অভ্যাস ? সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও, বলছি ! নাহলে চিরকালের মতো আলাদা করে দেব তোমাদের !

মেরী : ওর কাছে অস্ত্র রয়েছে !

মার্লো : ও তোমার কিছু করবে না, মেরী।

শেক্স : মার্লো ! তুমি ! মার্লো !

মার্লো : ওর কাছ থেকে সরে যাও।

শেক্স : তুমি ! তুমি, মার্লো !

মার্লো : সরে যেতে বলছি তবু—

[মার্লো শেক্সপীয়রের দিকে ছুটে যায়। ধাক্কা খেয়ে টেবিলের ওপর পড়ে। মোমবাতি উল্টে যায়। দ্বিতীয়বার ছুটে যায়। শেক্সপীয়রের ধাক্কায় নিজের হাতের ছোরা কাঁধে বসে যায়। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সব থমকে যায়। তারপর শেক্সপীয়র দৌড়ে গিয়ে মার্লোর মাথা এক হাত দিয়ে তুলে ধরে।]

মেরী : মারা গেছে ? ও কি মারা গেছে ? ওঃ, এর আগে আমি কাউকে কখনো মরতে দেখি নি !

মার্লো : ওঃ !

শেক্স : ও কি ?

মার্লো : আঃ···আমি যে আরও বাঁচতে চেয়েছিলাম···। মৃত্যু ! তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন এলে ? আঃ···আমায় বাঁচতে দাও···জীবনটা বড় সুন্দর··· (মৃত্যু)

মেরী : এখন কি করব আমি ? দেরি করা বিপজ্জনক···কি করি ?··· উইল ! উইল !

শেক্স : তোমার গলায় এত গান ছিল···সব ফুরিয়ে গেল ! এ আমি কি করলাম ?

মেরী : উইল, এখন হাহুতাশ করার সময় নেই। উইল !

শেক্স : ঐ শোন ! কার দীর্ঘশ্বাস !

মেরী : ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ।

শেক্স : কান্নার শব্দ পাচ্ছ—

মেরী : বৃষ্টি পড়ছে। এই কি স্বপ্ন দেখার সময় ? ভোর হয়ে আসছে— যত সময় যাচ্ছে তত বিপদ বাড়ছে। কি করব এখন ?—

শেক্স : (হঠাৎ ফেটে পড়ে) চুপ কর বাজে মেয়েলোক ! বেশ্যা কোথাকার ! মৃত্যুর সামনে স্তব্ধ হতে পার না ? কাঁদ…চোখের জল ফেল ! তুমি ওর প্রেমিকা ছিলে না ? ওর পাওনা চুকিয়ে দাও—চোখের জল দিয়ে ওর রক্ত ধুয়ে দাও—

মেরী : কি ? নিজের অপরাধ আমার কাঁধে চাপাচ্ছ ? আমি বেশ্যা ? আমার বিচার করছ তুমি ? তুমি নিজে কি ? জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী…বিয়ে করে গোপন করে রেখেছ…আর হত্যা করেছ মার্লোকে যে তোমার চেয়ে হাজার গুণে বড়—

শেক্স : সবাই জানে সে কথা ।

মেরী : আর কেঁদে চলেছ যতক্ষণ না পাহারাদার এসে রানীর কাছে আমাদের ধরে নিয়ে যায় ।…রানী ভীষণ রেগে আছেন গত কয়েকদিন ধরে… কেউ ওর সামনে যেতে সাহস করছে না,…ওর পুতুলের ঘরের এই এক দামী পুতুল আমার জন্য ভেঙে গেছে…রানী জানতে পারলে… ওঃ, আমার ভয় করছে…রানীর এক টুকরো হাসি, বরফের মতো চোখ…উইল ! উইল ! ওর দিকে তাকিয়ে থেক না—ও মারা গেছে ! কিন্তু আমরা বেঁচে আছি—আমাদের কথা ভাব !

শেক্স : কে ? মেরী ?—তুমি কি মেরী ? তুমি কি ওকে এত ভালোবাসতে ? না হঠাৎ খেয়ালে ছুটে এসেছিলে—

মেরী : ভোর হয়ে আসছে !

শেক্স : তুমি কি আমাকে কোনোদিন ভালোবাস নি ?

মেরী : কেমন করে বাঁচব আগে তাই চিন্তা কর ।

শেক্স : আগে আমায় উত্তর দাও ।

মেরী : তোমার কি ফাঁসি যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে ?

শেক্স : উত্তর দাও !

মেরী : জীবনের দোহাই—

শেক্স : উত্তর দাও !

মেরী : কোনোদিন তোমায় ভালোবাসিনি । পেয়েছ উত্তর ?

অ্যানের কণ্ঠস্বর : গত বাসন্তী পূর্ণিমায়—চাঁদের আলোয়—

শেক্স : গত বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় যখন লণ্ডন ভেসে গিয়েছিল, সেই জ্যোৎস্নার কুহকে তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে ।

মেরী : তুমি জান তা প্রেম ছিল না ।

শেক্স : সেই জ্যোৎস্না রাতে আমায় কাছে টেনে অতি যত্নে…চুপি চুপি আমায় বল নি 'ভালোবাসি' ।

মেরী : সেই রাতে আমি স্বপ্ন-বিভোল ছিলাম ।

শেক্স : সেই রাতে—সেই রাতটির জন্য অন্তত তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে ।

মেরী : আমি জানি না ।

শেক্স : পৃথিবী বদলে যেতে পারে—চাঁদের সব আলো মুছে যেতে পারে— সমস্ত পর্বতশিখর সাগরে লুকোতে পারে—কিন্তু সেই রাতে, আমার চরম জয়ের মুহূর্তের ভালোবাসা মিথ্যে হতে পারে না !

মেরী : সে কি প্রেম ছিল ? হয়তো তোমায় আমি ভালোবাসতে পারতাম যদি তুমি আমায় ভালোবাসতে শেখাতে ! তোমার কাছে আমি প্রেম চেয়েছিলাম—পাই নি ।—না পেয়ে ভুলে গিয়েছি আমি কি চেয়েছিলাম । এখন আমি বাঁচতে চাই…তোমার জন্য আমি নিজের সর্বনাশ করতে পারব না ।

শেক্স : মেরী, তুমি জান না আমি তোমায় কত ভালোবাসি । মেরী ! আমায় দয়া কর !

মেরী : কি আছে তোমার আমায় দেওয়ার ? তুমি বিবাহিত—আমি তোমার সন্তানের মা হলে তাদের কোনো নাম দেবার অধিকারটুকু তুমি দিতে পারতে ? উইল ! তুমি আমার ভালোবাসার যোগ্য নও !

শেক্স : আমি কি করেছি যার জন্যে—

মেরী : মিথ্যে বলেছ আমায় ! মিথ্যে কথা বলেছ !

শেক্স : যদি মিথ্যে বলে থাকি—

অ্যানের কণ্ঠস্বর : তোমাকে পাওয়ার জন্য ।—তোমাকে হারানোর ভয়ে… যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম !

শেক্স : তোমাকে হারানোর ভয়ে আমি মিথ্যে বলেছিলাম—যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম !

মেরী : তুমি এত নোংরা, নীচ, ক্লীব যে যন্ত্রণার জ্বালায় আত্মসম্মান ভুলে গেলে—মিথ্যে কথা বললে ! উইল ! উইল, ভালোবাসার যোগ্যতা তোমার নেই—কাউকে এত ভালোবাসা তোমার বোকামি ।

শেক্স : কিন্তু এই বোকামি—এই অযোগ্যতা থেকেই পৃথিবীর যত গান জন্ম নেয়—

[ঘোড়ার খুরের শব্দ]

শেক্স : মেরী !

মেরী : ওরা কারা ? সরে যাও তুমি। তোমার সুযোগ তুমি নিজে নষ্ট করেছ, কিন্তু আমাকে পালাতে হবে। শোন ! এখানে একটি অল্পবয়স্ক লোক ছিল ; একজন ফ্রান্সিস্ আর্চার—কোনো মেয়ে নয়, একজন অল্পবয়স্ক লোক—তুমি তাকে চেন না !

শেক্স : মেরী, আমি তাকে চিনি না !

[সরাইখানার চত্বরে কয়েকটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

মেরী : তুমি যদি আমাকে না যেতে দাও তাহলে আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব—শপথ করে বলব যে ওই লোকটিকে তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছ। ওরা এখনো মদ খাচ্ছে।

[দরজা খোলে]

সবাই একসাথে : (বাইরের ঘরে)

তুমি আমার প্রাণের খুশি
তুমি আমার সুখের চাওয়া—
তোমার সুরে সুর মিলিয়ে
হোক না আমার গানটি গাওয়া—।

মেরী : যদি তুমি পালিয়ে যেত পার, আমার কাছে কোনো খবর পাঠিও না আর নিজেও এস না।

[বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ে। শেক্সপীয়র আধখোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে]

প্রথম ব্যক্তি : ওকে আটকাও।

মেরী : আমাকে যেতে দিন।

[ভিড়ের ভেতর মেরী হারিয়ে যায়। শেক্সপীয়র ঘরের দিকে ফিরে দাঁড়ায়—দরজা ছুলে বন্ধ হয়ে যায়]

শেক্স : মার্লো ! মার্লো ! মেরী চলে গেছে—আর আমাদের ও বিরক্ত করবে না। এবার তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। মার্লো ! কিট্, কেন তুমি এমন করলে ? আমি যে তোমার। আমি তোমায় ভালোবাসতাম সে কথা ভুলে গেলে ?

[দরজায় আঘাতের শব্দ]

কে ? মেরী ? তুমি চুপ করে শুয়ে থাক মার্লো ! আমরা ওকে এখানে আসতে দেব না।

হেন্স্ : ভেতরে কে ? ভেতরে কে ?

শেক্স : দুজন মৃতলোক।

হেন্স্ : মার্লো আছ ভেতরে ? উইল আছ ?

শেক্স : কে ? ভেতরে এস।

[হেন্স্লো দ্রুত ঘরে ঢোকে। দরজা আধখোলা থাকে]

হেন্স্ : আরে ! অন্ধকারে চুপ করে বসে আছ ? কি ব্যাপার ?—কোনো গণ্ডগোল হয়েছে ? যাক যেতে যেতে শুনব কি ব্যাপার। রানী জরুরী তলব করেছেন তোমাকে—রাগে গুম হয়ে আছেন উনি। বাব্বা ! গোটা লণ্ডনটা চষে ফেলেছি···শেষকালে শুনলুম মার্লো এসেছে ডেপ্টফোর্ডে—আমি ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছুটেছি যদি তোমার পাত্তা পাওয়া যায় !

শেক্স : হেন্স্লো, ওই দেখ !

হেন্স্ : কে করেছে এ কাজ ?

শেক্স : আমরা—আমি আর সে। আর একজন ছিল এখানে।

হেন্স্ : সরাইখানায় ঢোকার মুখে দেখলুম এক অল্পবয়সী ছোকরা খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল, অন্ধকারে মুখ দেখতে পাই নি···শুধু শুনলাম "তাড়াতাড়ি"। সেই ছোকরাই কি—

শেক্স : হ্যাঁ, সেই।

হেন্স্ : কে ? কে সে ?

শেক্স : মৃত্যু। ঐ তার শিকার ফেলে গেছে। কিছু করতে পারবে হেন্স্লো ?

হেন্‌স্ : না। কিন্তু তোমাকে বাঁচাতে হবে। তোমাকে এখানে কেউ চেনে ?

শেক্স : যমকে যেমন চেনে লোকে। হেন্‌স্‌লো, সব শেষ হয়ে গেল!

সরাইওয়ালা : (দরজার ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে) কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি ?

হেন্‌স্ : গণ্ডগোল ? গণ্ডগোল কেন হবে ? শোন, আমাদের তাড়া আছে ; আস্তাবলের সহিসকে বল আমাদের এক্ষুনি আর একটা ঘোড়া চাই।

[উইলের হাতের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দরজার দিকে নিয়ে যেতে থাকে]

সরাইওয়ালা : ওনার কি শরীর খারাপ ? টলছেন ?

হেন্‌স্ : তোমার মদের গুণ।

প্রথম ব্যক্তি : হেঁ হেঁ দাদা। সারের সেরা মদ এই সরাইখানায় পাওয়া যায়।

হেন্‌স্ : আচ্ছা তোমরা এবার পথটা ছাড়। মহারানী ডেকেছেন এই লোকটিকে।

লোকেরা : (দরজার কাছে ভিড় করে) রানী ! রানী ! রানী পাঠিয়েছেন ? রানীমার জয় !

হেন্‌স্ : সরাইওয়ালা ! তোমার লোকজন সরাও।

প্রথম ব্যক্তি : (টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে) রানীমার জয় ! বল, রানীমার জয় ! ও দাদা ! একটা লোক যে শুয়ে রয়েছে।

হেন্‌স্ : হ্যাঁ, আমাদের লোক। ও শুয়ে থাকুক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ওরও কি নেশা হয়েছে ?

প্রথম ব্যক্তি : নেশা আবার হয় নি ! কাপড়ময় মদের দাগ। এঁঃ, দেখেছ কত মদ নষ্ট করেছে !

সরাইওয়ালা : চল, চল সব। শুনলে তো ওদের তাড়া আছে।

প্রথম ব্যক্তি : ওকে কি জাগিয়ে দেব ?

শেক্স : হ্যাঁ, ওকে জাগিয়ে দাও। আর যদি না পার তাহলে ওকে হিংসে কর কি করে ও এত গভীর ঘুমোচ্ছে ভেবে।

[দরজা দিয়ে উইল আর হেন্‌স্‌লো বেরিয়ে যায়। বাকি লোকেরা গান ধরে]

গান : যমরাজ গো, লক্ষ্মী দাদা,
ঘুচুক তোমার আপদ বালাই,
এখন এসো তোমার সাথে
বোতল নিয়ে ফুর্তি চালাই !
যমরাজ গো, লক্ষ্মী দাদা,
জানি তোমার মনটি সাদা,
দোহাই ছেড়ে দাও আমাদের
প্রাণটা নিয়ে ঘরে পালাই॥

[দরজা দুলে বন্ধ হয়ে যায়। ঘর আস্তে আস্তে আলোকিত হতে থাকে। ভোরের সূর্যের আলো এসে পড়ে বিছানার ওপর। পাখিদের কলরব শুরু হয়]

—পর্দা—

(আগামী বারে সমাপ্য)

মিহির পাল

জীবনের মুখ

গঙ্গার বুক থেকে জলকণা সংগ্রহ করে উত্তুরে হিমেল বাতাস অনবরত ঝাপটা মারছে চিতাকটির বুকে। হাওয়ার স্পর্শে চিতা লেলিহান হয়ে উঠছে, সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আগুনের শিখা ডাইনে বামে হেলছে, দুলছে, নাচছে।

একটি চিতাকে কেন্দ্র করে বসেছিল ওরা শীতকে এড়াবার জন্যে যথাসম্ভব চিতার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে, ওরা পাঁচজন—মনোজের দাদা সরোজ আর মনোজের পূর্বতন মেসের বন্ধুরা—দীপ্তেন, কার্তিক, রবি ও অনন্ত। শান্তিময় আর বারীন পাটকাঠি হাতে করে চিতাকে ঘুরে ঘুরে বসে নিচু হয়ে ভাল করে আগুন ধরাচ্ছিল। চিতার আগুনের ছাটে তাদের মুখ শক্ত ও কঠিন লাগছিল। দখিন-শিয়রে-মাথা মনোজের সর্বাংশ ঘিরে আগুন জড়াচ্ছিল। অনেক আদরে সে যেন মনোজকে কোলে তুলে নিচ্ছিল।

সরোজ এতক্ষণ শূন্যচোখে ভাইয়ের ফর্সা দেহটার ক্রমে ক্রমে কালো হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করছিল। আর সারাটা বিকেল সন্ধ্যা শোকের ভান করতে থাকা সরোজের এই প্রথম দুঃখে কষ্টে বুকটা টাটাল। দীপ্তেন এই সময় চিন্তায় ধূসর হতে পারত। জলন্ত চিতার দিকে তাকাতে তাকাতে জীবন ও মৃত্যুর বিপরীত কোটিতে অবস্থানকে নিয়ে ভাবতে বসে দীপ্তেনের পক্ষে গঙ্গার মতো উদাস হয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল।

পূর্বতন মেসের বন্ধুরা মনোজকে বাঁচাবার লড়াইতে নেমেছিল। দীপ্তেন ও অন্যান্য সবাই। প্রথমটাতে তারা যথাসাধ্য দিয়েছিল—অর্থ, প্রীতি, সহানুভূতি—সব। ক্রমশ তারা নিজেদের দেউলিয়া হয়ে যেতে দেখল। তাদের মনে হচ্ছিল মনোজ তার কুকড়ে-যাওয়া বিশীর্ণ হাত দিয়ে অনেকদিন ধরে তাদের রুগ্ন দেহের অস্থি মাস মজ্জা চুষে চুষে খাচ্ছে। হাসপাতালে জীবনমৃত্যুর সীমায় ঝুলে থাকা মনোজকে নিয়ে তারা অসহিষ্ণু, বিরক্ত ও

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আজ দুপুরের পর মনোজ মরল। দীপ্তেনের পক্ষে সে হিসেবে নির্ভাবনা ও খুশি হয়ে ওঠাও সম্ভব ছিল।

কিন্তু দীপ্তেনের চেতনার মাঝে এ সব কোনো চিন্তাই ঠাই পাচ্ছে না। একটি জীবনের অবশেষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে আজ মৃত্যু ও মৃত সম্বন্ধে সমান উদাসীন। তার মনের মাঝে বন্দী বাঘটা খোঁচা খেয়ে গুমরাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষ রাতের নিশ্ছিদ্র আঁধারের মাঝে দপ্ দপ্ করে জ্বলা রক্তিম চিতা কটির মতো তার সমস্ত সত্তা দগ্ধ হচ্ছে, পুড়ছে সেই দুপুর থেকে। বরং অনেক দিনের জলন্ত একক শিখাগুলো আজ দুপুরে সন্নিবিষ্ট হয়ে হঠাৎ মশাল হয়ে উঠেছিল। আর সে জলন্ত মশালের লক্লকে আগুন বুকের ভেতরটা পোড়াচ্ছে।

ঘণ্টা কয়েক আগে বিকেলের মরে-আসা আলোর মধ্য দিয়ে বাসের দোতলায় সে বসে বসে আসছিল। অন্যদিন হলে এ সময় তার দৃষ্টিকে রাস্তায় ছড়িয়ে রাখত, চলতি বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই (কোনো কোনো দিন বসেও বা) বিক্ষিপ্ত নানা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে যথাসম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েগুলোকে দেখত—বুক, মুখ, শাড়ি বা ব্লাউজের রং ইত্যাদি। কিন্তু আজ দোতলার জানলার পাশে বসবার সুযোগ পেয়েও সে কিছু দেখছে না। চোখ আর তৃষ্ণায় ঝিকিয়ে উঠছে না। ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ—সব তার শুষে নিয়েছে নিঃশেষে। সেই দুপুরের ব্যাপারটা, তার পরে দৃষ্টিকে পিনবিদ্ধ করে রেখে দীপ্তেন ভাবছিল ভীষণভাবে। একটা মনুষ্যসুলভ অপমানবোধ ও জ্বালা তাকে অনবরত খোঁচাচ্ছে।

ভুল হয়েছিল তার—ভুল। স্টেট্‌মেণ্টটা তৈরিতে একটা ভুল করে ফেলেছিল সে। তাদের ফার্মের কমার্শিয়াল ম্যানেজার সে ভুল ধরেছেন। আর তিনি একাউণ্টেণ্ট দত্তসাহেবের মাধ্যমে বড়বাবু ও স্টাফের একস্প্লানেশন চেয়েছেন। সে স্টেট্‌মেণ্টে সই করলেও দত্তসাহেবের যে কিছু হবে না—তা দীপ্তেন জানত। অফিসারদের কোনোদিন কিছু হয় না। আর দত্তসাহেবের কাছে ভুলের জবাবদিহি চাওয়াটাও মামুলি, রীতিমাফিক। ও শালা, গোটা ভারতব্যাপী এদের অসংখ্য কলকারখানায় ও অফিসগুলোতে একযোগে স্ট্রাইকের সময় অফিসে তো রোজ এসেইছে উপরন্তু এ সুযোগে তাদের নামে অফিসারদের কাছে চুকলি খেয়েছে। আর তার ভিত্তিতেই অবাধ্যতার অজুহাতে দীপ্তেনের প্রিয় বন্ধু নীরেনের চাকরি গেছে। আরও

গেছে সঞ্জয়ের ও অমিয়ের, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কারখানায় বদলী হয়েছে দেবব্রত ও রতনদা। আর গত ক'মাস ধরে ছেলেকটি এখানে ওখানে ঘুরছে নেড়ীকুকুর হয়ে খোয়ানো চাকরি ফিরে পাবার আশায়। বাইরে বদলী রদ করে কলকাতার অফিসে ফেরার জন্যে। হন্যে হয়ে ঘুরে মরছে রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তরে, বিভিন্ন মন্ত্রীদের বা তাদের স্নেহভাজন ব্যক্তিদের দরজায় দরজায় এবং ওদের কর্তাভাজন ব্যক্তিদের পিছু পিছু। আর একদিকে ওদের চোখে অনির্বাণ জ্বলছে ক্রোধ, রোষ ও ঘৃণা। কিছু না করতে পারার অক্ষমতায় ওরা ফুঁসছে।

আচমকা একটা শব্দ শুনে ওরা সবাই চমকে উঠেছিল—দীপ্তেন, কার্তিক, সরোজ, রবি ও অনন্ত। চিতাকে ঘিরে ঝিম মেরে বসে থাকা মূর্তি কটি হঠাৎ আঁতকে উঠেছিল। বারীন আর শান্তিময় চিতায় আগুন ধরাতে ধরাতে হঠাৎ জ্বলন্ত পাটকাঠি হাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এদের ছায়া পেছনের এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালে অসম দেখাচ্ছিল। আর দুজনের মুঠো-করা পাটকাঠি হতে জ্বলন্ত শিখা উড়ন্ত হাওয়ার তোড়ে দক্ষিণে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। বারীন খানিক দূরের একটা জ্বলন্ত চিতাকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, বাবা! একখানা মাথা বটে! কি শব্দ করে ফাটল। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল। তারপর পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ফলে গলায় একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল।

দীপ্তেন ভাবছিল দত্তসাহেবের দামী মাথাটাও চিতার আগুনে পুড়বার সময় এমনি শব্দ করে ফাটবে কিনা। আজ দুপুরে দত্তসাহেব তার ঘেরা-ঘরে ডেকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে বিচারকের ভঙ্গিতে মাথাটা ডাইনে বামে নাড়ছিলেন। দীপ্তেনের একসময় চায়ে চামচ নাড়ার কথা মনে পড়েছিল। দত্তসাহেব তার মোটা ফ্রেমের চশমা চোখ থেকে খুলে সোজাসুজি দীপ্তেনের চোখে চোখ রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলছিল, ইনক্লাব করবার সময় তো ভুল হয় না—কাজে ভুল হয়ে গেল কি করে দাসবাবু! তারপর টাইয়ে বাঁধা কোটে ঢাকা শরীরটাকে চেয়ারে হেলান দিইয়ে পাইপটা ধরালেন। ধরাতে গিয়ে চোখমুখ কুঁচকে দীপ্তেনকে খুঁটে খুঁটে গরুহাটার গরু ক্রেতার মতোই যাচাই করছিলেন।

কথাটায় শ্লেষ, ভঙ্গিতে অপমানের সুর দীপ্তেনকে বিঁধছিল। কিন্তু বর্ষার জলের মতো ঘোলাটে সে চোখের দিকে তাকিয়ে সে কোনো

জবাব দিতে পারে নি। শুধু মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘামছিল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে দাঁড়িয়ে জামার তলায় ছায়ার বুনে দেওয়া একটা পাতলা সোয়েটার-পরা দীপ্তেন ভীষণ গরম অনুভব করছিল। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার ঘর্মস্নাত বলে বোধ হচ্ছিল। তার কান চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল—সে বুঝতে পারছিল। তার গলা শুকিয়ে এসেছিল। বসতে পেলে সে বেঁচে যেত।

কিন্তু বসার কথা বলতে দীপ্তেন সাহস করে নি। অথচ আগস্টের স্টাইকের আগে অসিত বলেছিল একদিন। কেরানি অসিত সেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছি স্যার। আমাদের অন্তত বসতে বলা উচিত। আমাদের উপোসী শরীরের পা তো। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রথমটাতে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন দত্তসাহেব। চশমা খুলে রেখে বোকা বোকা চোখে খানিকক্ষণ অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হাতের পাইপটা টানতে তিনি ভুলেই গেলেন। আগুনটা বোধ হয় নিভেই গেল। সম্ভবত সামান্য একটা কেরানির ঔদ্ধত্যে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, এত সাহস এদের কোথা হতে জোটে। তারপর সামলে নিয়ে ভারি গম্ভীর মুখখানায় ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, Is it ?

অসিতের ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। চ্যাংড়া ছোকরা অসিতকে তখন বয়স্ক ও বিশিষ্ট দেখাচ্ছিল। শক্ত মুখে সে জবাব দিয়েছিল, আমার তো তাই ধারণা।

দত্তসাহেব যেন খেলা করছেন, Are you sure you are not demanding too much ?

তারপরই ঘর থেকে তিনি তাদের চলে যেতে বলেছিলেন।

কদিন বাদে অসিতের উত্তরপ্রদেশের এক কারখানা-অফিসে বদলীর আদেশ এল। বোধ হয় এত তুচ্ছ কারণে অসিতের স্থায়ী চাকুরি খতম করা সম্ভব হল না। অথবা হয়তো দত্তসাহেব পুরো বঞ্চিত না করে কিঞ্চিৎ করুণা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু আজ? অসিতের সে ঘটনাটা যদি আজ ঘটত! স্ট্রাইকের পরের এই আতঙ্কগ্রস্ত থমথমে আবহাওয়ায় এ কথাটা যদি অসিত বলত! তবে?

তবে কি হত—সে ব্যাপারটা আর চৌবাচ্চার অঙ্কের মতো জটিল কিছু নয়। তাহলে আজ হয়তো অসিতের বিধবা মাকে নীরেনের স্ত্রীর মতোই দত্তসাহেবের ঘরে ঢুকে কাঁদতে দেখা যেত আর দত্তসাহেব ভারি গলায় বলতেন, চোখের জলের বৃথা অপচয় করছেন মিসেস সেন। এই জলটা যদি ছেলের পেছনে ব্যয় করতেন তাহলে বোধ হয় উপকার হত—আপনার আর আমার দুজনের পক্ষেই।

তবে এটা ঠিক—বৃদ্ধাকে দত্তসাহেব নিশ্চয়ই রোরুদ্যমানা নীরেনের স্ত্রীকে বলা কথাকটির পুনরুক্তি করতে পারত না। 'আপনি নাকখত দিতে পারেন নীরেনবাবুর অপরাধ-স্বীকৃতির স্বাক্ষর হিসেবে। পারেন?' তারপরই একটা উৎকট আনন্দে পৈশাচিক বিজয়োল্লাসে মাতাল-হয়ে-ওঠা দত্তসাহেব তার ঘেরা-ঘরের বন্ধ আবহাওয়াকে ঘুলিয়ে দিয়েছিল। আর তার হাসির হোস পাইপের মধ্য দিয়ে চোখে আঁচল চাপতে চাপতে নীরেনের স্ত্রী রমলা সেকসনের টেবিল চেয়ার মাঝের জ্যামিতির রেখা ধরে দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল। আহ, দীপ্তেন আর তার সহকর্মীরা প্রস্তরীভূত হয়ে শুধু সেই দৃশ্য দেখছিল। অনেক সোচ্চার প্রতিবাদের আগুন তাদের মাথায় জলে উঠতে চাচ্ছিল। কিন্তু তারা বসে বসে নিষ্ক্রিয় থেকে সে আগুন নিভিয়ে ফেলেছিল। দীপ্তেন শুধু স্মৃতিকে আশ্রয় করেছিল। বসে বসে বন্ধু নীরেনের স্ত্রী সপ্রতিভ রমলার বিভিন্ন দিনের বুদ্ধিদীপ্ত কথাগুলো সে নাড়ছিল।

—বলো হরি…

—হরি বোল।

—বলো হরি-ই-ই-ই…

—হরি বো-ও-ও-ও-ল্।

হরিধ্বনি নয় যেন এক বীভৎস আতঙ্ক ঝড়ো হাওয়ার মতো এখানকার থমথমে আবহাওয়ার 'পরে, হাড়-কাঁপানো উত্তুরে বাতাসের প'রে হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার সাথে পুত্রশোকাতুর এক বৃদ্ধের উচ্চকণ্ঠ বিলাপ চিতা কটিকে ও ঘিরে-থাকা মানুষগুলোকে সচকিত করে তুলেছিল। দীপ্তেন, সরোজ, রবি, অনন্ত, কার্তিক—সবাই ঘাড় ফিরিয়েছিল, শান্তিময় আর বারীন জলন্ত পাটকাঠির অবশিষ্টাংশ চিতার তলায় গুঁজে

দিয়ে ওদিকটায় ছুটে গিয়েছিল। গভীর রাতে চৌবাচ্চার মাঝে জল পড়ার মতো একটা কান্নার আওয়াজের একটানা তিরতিরে শব্দ এতক্ষণ দীপ্তেনদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঠিক কোথা থেকে শব্দটা উঠে আসছিল ওরা কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না। আর বুঝবার কোনো তাগিদও ওরা অনুভব করে নি। শ্মশানের বুক হতে উঠে-আসা ঐ একটানা ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে শোকস্বরের মাঝে ওরা অন্তর্লীন হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণের সেই শব্দটা এক্ষণের ঢেউয়ের ভেঙ্গে-পড়া গর্জনের মাঝে চাপা পড়ল।

দীপ্তেন দেখছিল হাত পনেরো দূরে নামিয়ে রাখা খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক শক্ত সুঠাম বৃদ্ধ হাউ হাউ করে আওয়াজ করছিল। তার ভেঙ্গে-পড়তে-চাওয়া, লুটিয়ে-যেতে-চাওয়া শরীরটাকে জনদুই লোক শক্ত হাতে ধরে রেখেছিল। দীপ্তেনের তাদের ছেড়ে-আসা-গ্রামের ঘরের পেছনের ফল-দেওয়া-বন্ধ-করা বাঁশের প্যালা দেওয়া কামরাঙ্গা গাছটার কথা মনে পড়ছিল।

খানিক বাদে বারীন আর শান্তিময় ফিরে এল। বারীন হাত-পা নেড়ে বোঝাতে শুরু করল ট্রেনের তলায় কাটা যাওয়াতে কোথায় কোথায় দেহ বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়েছে। বারীন 'বলছিল, চাদরটা একবার তুলেছিল। মাথার আধখানা প্রায় উড়ে গেছে। কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। একখানা চোখ একদম নেই। কি দেখাচ্ছে মাইরি! বারীন একটা কৌতুকাবহ ভঙ্গি করল।

দীপ্তেনের মনে হচ্ছিল, বারীনটা বড় বেশি ইতর হয়ে যাচ্ছে। একটা শোকাহত অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ও ব্যঙ্গ করছে অবলীলাক্রমে।

আজ দুপুরে দীপ্তেন দত্তসাহেবের ঘেরা ঘরে আর এক ব্যঙ্গের ও বক্রোক্তির সম্মুখীন হয়েছিল, চেয়ারে ঠেস দিয়ে পাইপটা টানতে টানতে দীপ্তেনকে দত্ত-সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলেন, কি শাস্তি আশা করেন দাসবাবু।

দীপ্তেনের ইচ্ছে হচ্ছিল মুখের 'পরে অগ্নিশলাকার মতো একটা অত্যন্ত রূঢ় উত্তর ছুড়ে দিতে। কিন্তু দীপ্তেন পারে নি। উপরন্তু সে নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে রাখছিল। তার চোখের সামনে কতগুলো মুখ ভাসছিল—ছায়ার, মায়ের, নীতা, রীতা ও তপনের। কতগুলো শুকনো মুখ, বিষণ্ণ দৃষ্টি তার চেতনাকে ক্রমে ক্রমে নিরুত্তাপ করে ফেলছিল।

বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে বাসে করে যেতে যেতে দীপ্তেনের মনে হচ্ছিল দত্তসাহেব তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে শিকারী বেড়ালের মতোই খেলছিলেন। আর খেলতে খেলতে সত্যি সত্যিই সাজার পরিমাণটার কথাই ভাবছিলেন। পাঁচ বছরের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করবে, না গত পাঁচ বছরের ইনক্রিমেণ্ট বাতিল করে দিয়ে পিছিয়ে মাইনে স্থিরীকৃত করবে। অসিতের মতো, দেবব্রত ও রতনদার মতো তিনি তাকে বাইরেও বদলী করে দিতে পারেন। আর বোধ হয় সেটা বেশি স্বাভাবিক।

স্টাইকের পরে এতগুলো পরিবারের সাধারণ কেরানীকুলের সর্বনাশ করেও দত্তসাহেবের ক্রোধের আর উপশম হচ্ছে না, তুষের আগুন হয়ে তা জ্বলছে।

তাদের মাইনে বৃদ্ধির দাবিতে তাদের কোম্পানীর ভারতব্যাপী সমস্ত মিল-কারখানা-অফিসের লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ধর্মঘট করেছিল। কিন্তু দত্তসাহেবের মতো অফিসারেরা এটাকে কেন ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করল! ক্ষুন্নিবৃত্তির দাবিকে (আহা, ইউ. এন. ও অভিযান শুরু করেছে পৃথিবীকে ক্ষুধা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। অভিযানের শিরোনামা—to attain freedom from hunger. কিন্তু তোমরা তাতে ভরসা রাখনি। নিজেরাই ধর্মঘট অস্ত্র হাতে নিয়েছ, ক্ষুধাকে, অভাবকে কবর দিতে পার নি কত পরিকল্পনার রুপোলি স্বপ্ন বোনা সত্ত্বেও। তোমরা বড্ড অধীর হয়ে উঠেছিলে। বাদলা পোকা যে মরবে সে তার বিধিলিপি। তার জন্যে আগুনকে দায়ী করা বৃথা। নীরেনের এক বন্ধু অনুপম চাকরী হারিয়ে অনাহারের জ্বালায় ও ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ যে ঘটবে এ তোমাদের জানা থাকা উচিত ছিল। দীপ্তেন, এখন এই পরিণতির কথা ভেবে হাহুতাশ করার কোনো মানে হয় না।) তারা তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধং দেহি বলে মনে করল! তারা নিজেদেরই কেন কোম্পানীর প্রতিভূ বলে ভাবছে আর শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী যারা কোম্পানীর বিপুল যন্ত্রকে নিরলস বয়ে চলেছে তারা যেন সব কোম্পানীর স্বার্থবিরোধী কণ্টক। তাই দত্তসাহেবরা সুযোগ পেলেই কুঠার নিয়ে কণ্টকের মূলোৎপাটনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ডিজেলের গ্যাস ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যাওয়া বাসে যেতে যেতে দীপ্তেন ভাবছিল—তার তৈরি স্টেটমেণ্টে ভুলের আশ্রয় নেওয়াটা একটা ছলনা। গণ্ডীবদ্ধ সীতাহরণ ব্যাপারে রাবণ এমনি একটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল।

তাকে বধ করবার একটা সূত্র খুঁজছিলেন দত্তসাহেব এবং তার ভুলের ছিদ্রপথ তিনি খুঁজে বের করেছেন।

স্ট্রাইকের ব্যর্থতার পরে তাদের কলকাতা অফিসের কর্মচারীদের বরখাস্ত ও সাসপেনসনের পটভূমিকায় প্রত্যেকটি কর্মচারী হতাশার মুখোমুখি হয়ে পড়ে ও তাদের মধ্যে ভীত ও ত্রস্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়। কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে (অর্থাৎ যে সমস্ত মুষ্টিমেয় কর্মচারী ধর্মঘটের আহ্বান উপেক্ষা করে অফিসে নিয়মিত হাজিরা দিয়েছে) তখন সবাই স্ব স্ব চাকুরী রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বড়বাবুদের নমস্কার করা, দত্তসাহেবকে দেখামাত্র উইস করা ইত্যাদি (যেগুলো আস্তে আস্তে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল) অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে চালু হয়ে যায়। আর তা ছোঁয়াচে রোগের মতোই ছড়িয়ে পড়ে। রেখে ঢেকে নয় প্রকাশ্যে খুশি করা, মনস্তুষ্টি-বিধান যেন প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে গেল।

আরও দু-চারটে ছেলের সাথে দীপ্তেন এ ব্যাপারে অসহযোগিতা করেছে প্রবলভাবে আর তাদের অনীহা সবার কাছেই ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে।

কাজেই দত্তসাহেবের ঘরে ঘটে যাওয়া আজকের ব্যাপারটা ও পরবর্তী ঘটনাবলী অনিবার্য নিয়মে ঘটতে থাকবে, তা অস্বাভাবিক নয়—দীপ্তেন জানে। সে তাই অবাক হয় নি। শুধু একটা প্রত্যক্ষ অপমানবোধ তার মনটাকে তাতাচ্ছে।

তাদের বাসার স্টপ ছাড়িয়ে বাসটা এগিয়ে গিয়েছিল। ভাবনার সমুদ্রে ডুবে থাকা দীপ্তেন হঠাৎ ভেসে উঠল এবং সচকিত হয়ে বাসের দোতলা হতে নেমে এল। ঘরে ঢুকতেই স্থলতা দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, দীপু এসেছিল। তোর একটা চিঠি আছে। মেসের ছেলেটা এসে দিয়ে গেল। নীতা, দে তো চিঠিটা তোর দাদাকে।

দীপ্তেন সাড়া দিল না, চিঠিতে আগ্রহ দেখাল না। হয়তো আগামীকাল রোববার ভোরেই তাস খেলতে যাবার নেমন্তন্ন পাঠিয়েছে তার পুরনো মেসের বন্ধু কার্তিক। মাঝে মাঝে কার্তিক তাকে এমনি চিঠি পাঠায়।

দীপ্তেন ঘর-ঝাট-দিতে-থাকা মাকে দেখতে থাকল। স্থলতার মুখে বয়সের, দুর্ভাবনার, অসুখের ও দারিদ্রতার অনেক ছাপ জড়ো হয়েছে। শীর্ণ মুখখানায় মাটি-ক্ষয়ে-যাওয়া বটের ভেসে-ওঠা শিকড়ের মতো অনেক আঁকিবুকি রেখা জমেছে, চোখ দুটো গর্তে বসে গিয়ে গভীর ক্লান্ত হয়েছে। তার কলকাতার

বাইরে বদলীর আদেশ বেরোলে (দত্তসাহেব সাজা হিসেবে যদি এটাই বেছে নেয়) স্থলতার মুখের অসংখ্য জ্যামিতিক রেখার মাঝে দুশ্চিন্তায় আরও কটি রেখা যুক্ত হবে। দৈনন্দিন সংসার চালানোর ভাবনা স্থলতাকে অনবরত পিষ্ট করে তুলছে। তাছাড়া নীতা ও রীতার বিয়ের চিন্তা রাতগুলোকে নির্ঘুম করে রাখছে। ওদের বড়দি মিতা নার্সিং শিখতে শিখতে আকস্মিক-ভাবে আত্মহত্যা করে। সেই থেকে স্থলতা ভয়ে ভয়ে আছে, নীতা নার্সিং শেখার দিকে ঝোঁকা সত্ত্বেও স্থলতা রাজী হয় নি। আর স্বল্পভাষী দীপ্তেনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্থলতা কোনো এক সময় অবজ্ঞা ও ঘৃণা আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায় বোমাবর্ষণের মুখোমুখি দাঁড়ান লোকটির মতো থরথর কাঁপছে, আর সেই অসহায় চাউনি মেলে রেখে স্থলতা যেন বলে চলেছে—দোহাই ছায়া, তুমি দীপ্তেনের কানে কোনো মন্ত্র দিও না। দোহাই দীপ্তেন, তুমি শুধু ছায়ার মাঝে সুখ খুঁজো না। আর আমাদের পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট জঞ্জালের মাঝে ঠেলে দিও না। আমাদের পিঠে বাড়তি, অতিরিক্ত বা নষ্ট মালের সীলমোহর চাপিয়ে দিয়ে গুদামঘরে ফেলে রেখো না।

স্থলতা তাই অনেক ভয়ে ভয়ে কাঁপে আর সংসারটাকে আগলে রাখে। ভয়, সংশয়, দুর্ভাবনা ও দারিদ্রতা পরিকীর্ণ জগতে স্থলতা অতন্দ্র জেগে থাকে। কিন্তু স্থলতা অনুভব করছে ভিত যেন ক্রমেই আলগা হয়ে যাচ্ছে। চুনবালি খসে খসে ইটের দাঁত ভেংচি কাটছে। আর দেখে দেখে ম্যালেরিয়ার-কাঁপুনি-লাগা স্থলতা বেশি করে ঠাকুর দেবতা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে।

নীতা ততক্ষণে দাদার হাতে চিঠিটা এনে দেয়। দীপ্তেন খাম ছিঁড়ে (কার্তিক যখনই চিঠি দেবে খামে পুরে আঠা জুড়বে। কার্তিকের এই বিলাসিতা আজও দীপ্তেনকে হাসাল) চিঠি পড়তে পড়তে বলে উঠল, যা! মনোজটা টেঁসে গেল। পোড়াতে যেতে হবে।

বলেই চিঠি থেকে মুখ সরাতেই দীপ্তেন দেখল, স্থলতা তার দিকে প্রশ্ন তুলে তাকিয়ে। আর সাথে সাথে স্থলতা বলে ফেলল, টিউশানি, টিউশানি যাবিনে আজ ?

দীপ্তেন দেখল, স্থলতার মুখে একটা আতঙ্ক থমথম করছে, কামাই করলেই টিউশানি হাতছুট হয়ে যাবে—এমনি একটা ধারণা স্থলতা পোষণ করে। টিউশানি কামাই করার কথা শুনলে স্থলতা ভয় পায়।

দীপ্তেন বলবে ভাবল, মা ভয় পেয়ে কোনো লাভ নেই। দত্তসাহেবের

কোপে পড়ে বোধহয় আমাদের কলকাতার পাট তুলতে হবে। টিউশানি দুটো এমনিতেই ছাড়তে হবে। তারপর কলেজের তপন, স্কুলের রীতার কি অবস্থা হবে—আমি জানিনে। সংসারের কি হাল দাঁড়াবে আমি বলতে পারিনে। মা, শুনে তোমার চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু এর কোনো প্রতিকার আমার অজানা। দত্তসাহেব আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করেন না। সামান্য ভুলে তিনি আমাদের খাঁচায় আটকানো জানোয়ারদের মতো খোঁচাতে থাকেন। আমি জানি, এখনই ছলছল চোখ তুলে তুমি আমায় দত্তসাহেবের পা জড়িয়ে ধরতে বলবে। আজ ঘেরা-ঘরে তাঁর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখে দত্তসাহেব বোধহয় মনে মনে সে অভিলাষই পোষণ করছিলেন। না মা, আমি তা পারব না, কখ্খনো না। কেননা, রমলার দুর্গতি আমি সচক্ষে দেখেছি, তাছাড়া যে ঘরের খোঁটা আলগা হয়ে গেছে, যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে—তা ঠেকা দেবার উৎসাহ আমার আর নেই। জোড়াতালি দিয়ে এ ঘরের বাঁধন আর ঠিক রাখা যাবে না। তা যাক্, একেবারেই ভূমিস্মাৎ হয়ে যাক্।

আসলে কিন্তু দীপ্তেন কোনো কথাই বলল না। চেয়ারে বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বারান্দা ছাড়িয়ে রান্নাঘরে দৃষ্টিটা বোলাল। একজোড়া ফর্সা হাতকে ইঞ্জিনের পিস্টনের ভঙ্গিতে এগিয়ে পিছিয়ে মশলা পেষাই করতে সে দেখছে। ছায়া এখন আসবে না—সে জানে। সাংসারিক কাজে নিরলস পরিশ্রম করা ও রাতে তাকে শয্যায় সঙ্গ দেওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আরও কিছু বুঝবার জানবার ভাববার থাকতে পারে—ছায়ার কাছে তা বোধগম্য নয়। ছায়া, তুমি এত ঠাণ্ডা হলে কেন—শীতল! তোমার মাঝে উত্তাপ নেই কেন—তাপ! চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, চারদিকের স্পর্শে ছোঁয়ায় আমি যে জুড়িয়ে যাচ্ছি, আমি যে ঝিমিয়ে পড়ছি।

দীপ্তেন ক্লান্ত স্বরে মাথা নাড়ল। যেন সে এতক্ষণে স্থলতার প্রশ্নের জবাব দিল।

মাঘ মাসের ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ছে চিতার বুকে। আর চিতা লেলিহান হয়ে জলছে। আগুনের শিখা মনোজের দেহটা প্রায় পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে। শান্তিময় আর বারীন খাটিয়া-ভাঙ্গা বাঁশ দিয়ে চিতাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছিল। নাভিটাকে উলটে পালটে পোড়াচ্ছিল। আর সেটাকে ছোট করাতে মনোনিবেশ করেছিল।

গঙ্গার বুক থেকে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া জলকণা সংগ্রহ করে তাদের 'পরেও ছোবল মেরে খুবলে খুবলে তাদের মাংস খুলে নিতে চাইছে, আর ওরা সবাই ঘন হয়ে চিতার আগুনকে ঘিরে শরীরকে ওম্ করে রাখার চেষ্টায় রত। অনেকক্ষণ কেউ বিশেষ কোনো কথা বলছে না। শুধু শান্তিময় মাঝে মাঝে অস্ফুটে কি বলছে। বারীন এক-আধটা কি মন্তব্য করছে। আর কার্তিক দীপ্তেনকে লক্ষ্য করে দু-একটা কথার হাউই মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কথার পিঠে কেউ কোনো কথা না জুড়ে দেওয়াতে কোনো ধারাবাহিকতা রক্ষা হচ্ছে না। উত্তুরে দমকা হাওয়া এসে বারবার তা মুছে দিয়ে যাচ্ছে।

হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে-পড়া সেই বুড়ো লোকটা এখন চুপ করে গেছে। জলে-ওঠা একটা চিতার পাশে অনেক লোকের মাঝে সে নেতিয়ে পড়েছে। সেই একটানা তিরতিরে কান্নার সুরটা আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

সরোজ ভাবছিল—এই বাকী রাতটুকু সে কোথায় কাটাবে। এত রাতে কৃষ্ণনগর কেন, কোথাকারও ট্রেন পাওয়া যাবে না। এই শীতের মাঝরাতে শ্মশানঘাট থেকে কোন আত্মীয়ের বাড়িই বা সে হানা দেবে।

মনোজকে পোড়াতে এসে দীপ্তেন আজ মরণের কথা ভাবছে না বা মরণকে নিয়ে মন ভারি করছে না। দীপ্তেন জানে মৃত্যু জীবনকে অসত্য করে তোলে। জীবন সত্য—তাই জীবনের জন্যে মানুষের এত ভালোবাসা। আর মনোজের এই মৃতদেহটা মিথ্যে বলেই তারা সবাই মিলে কত সহজে তাকে ভস্মীভূত করে ফেলল।

দীপ্তেন শুধু আজ দত্তসাহেবের আক্রমণের হিংস্র অস্ত্রগুলোর কথাই ভাবছে আর ভাবছে বিশেষ করে কেরানীকুলের কথা, যারা টিঁকে থাকার তাগিদে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করছে আর আত্মসমর্পণ করছে।

দীপ্তেন ভাবছে, তাদের দীন অবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন দত্তসাহেব। তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার খবর, পারিবারিক জটিল পরিস্থিতির সংবাদ—সব পৌছে গেছে দত্তসাহেবদের কাছে। অথবা তাদের মাঝের জোটের অনাস্তিত্বের খবর দত্তসাহেব জানেন বলেই তিনি সাহস সঞ্চয় করেছেন। আর এ-সবের আচ্ছাদনে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের মতো তিনি অস্ত্র ছুড়ে যাচ্ছেন অনবরত। দত্ত-সাহেব এ ক'মাস ধরে অর্ডারের পর অর্ডার চালু করেছেন, নিষেধাজ্ঞার পর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। তাদের কোনঠাসা করে ফেলেছেন দত্তসাহেব। তিনি ঠিক বুঝে নিয়েছেন, তারা—কর্মচারীরা দাবি আদায়ে নেমে পশ্চাদপসরণ

করেছে। তাদের জোট ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং এই সুযোগে আঘাতে আঘাতে পঙ্গু করে ফেলতে হবে যাতে তারা আর কোনোদিন সোজাপায়ে দাঁড়াতে না পারে।

তাই নীরেনের চাকুরী গেল, চাকুরী গেল সঞ্জয়ের ও অমিয়ের। বাইরে বদলী হল দেবব্রত ও রতনদা। একহাট লোকের মাঝে তুমি দত্তসাহেব রমলাকে অপমান করতে দ্বিধা করলে না। কেরানীদের তুমি বিকেল পাঁচটার সময় ফিরবার পথে সই করতে বাধ্য করছ, রোজ কাজের শেষে লাইন দিয়ে কাজের ফিরিস্তি আমাদের দাখিল করতে হচ্ছে। সেই লাইনে এগুতে এগুতে সাপ্তাহিক রেশন-পাওয়া রিফিউজিদের কথা আমার মনে পড়ে। লাইন দিয়ে এগুনোটা বিছুটি লাগার মতো মনে জ্বালা ধরায়। কম কাজ ও ভুলের জন্যে তুমি অহরহ আমাদের জবাবদিহি দাবি করছ ও চার্জশীট দিয়ে যাচ্ছে। আর তাতে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েই যাচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইনক্রিমেণ্ট বন্ধের আদেশ জারী করতেও তুমি দ্বিধা করছ না। সামান্য চার টাকা করে বার্ষিক মাইনে বৃদ্ধি তাও বন্ধ করে তুমি আইনের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছ। সেকসনে আকস্মিকভাবে এসে তুমি মাঝে মাঝে হাজির হচ্ছ। কাউকে সিগারেট বিড়ি খেতে বা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখলে তুমি অপমানজনক উক্তি করতেও দ্বিধা করছ না। সেকসনে দাঁড়িয়ে পা চেয়ারে বা টুলে তুলে দিয়ে পাইপ টানতে টানতে তুমি দত্তসাহেব অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে ঘাড়টা এদিক-ওদিক ঘোরাও। একদল পতিত মানবদের মাঝে তুমি দয়া বিলোবার ভঙ্গি কর। আসলে তুমি একটা ভীতিকর আবহাওয়া বজায় রাখতে ভালোবাসো আর কই মাছ জিয়োনোর মতো করে সেই অবস্থাটা টিকিয়ে রাখছ।

এইসব করতে তুমি সাহস পাচ্ছ কারণ আমরা বিচ্ছিন্ন ও একক হয়ে পড়ছি। চাকুরীর সাথে টিউশানির উপরি রোজগার জুড়েও আজ পৃথিবীতে চলতে আমরা নাজেহাল হয়ে পড়ছি। চাকরী খোয়ালে আমরাও অনুপমের মতো জগতে টিকে থাকার ন্যূনতম ভিত্তিভূমিও হারিয়ে ফেলব—তা তুমি জান। আর জান বলেই, দত্তসাহেব, আমাদের প্রতি অবহেলা, তাচ্ছিল্য ও অসম্মান দেখাতে তুমি অকুণ্ঠ।

উত্তুরে হাওয়ার মৃত্যুশীতল হাত হতে অব্যহতি পাবার আকাঙ্ক্ষায় দীপ্তেনরা ঘন হয়ে চিতার পাশে বসে। সেইখানে মনোজের মৃতদেহ এইমাত্র

দাহ করা হল। নাভির শেষ টুকরোটা পোড়াবার জন্যে বারীন আর শান্তিময় শিখা সরে আসা গনগনে চিতাটা খোঁচাখুঁচি করছে। আশেপাশে বা খানিক দূরে আর কটি চিতা জলল বা নিভল। ঘন অন্ধকারের বুকে লাল আগুন কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ছাই আর ধোঁয়া উড়ছে অবিরাম। কান্নার সুর এখানে-ওখানে ঠাণ্ডা হাওয়ার মতোই শিষ খেয়ে খেয়ে ছড়াচ্ছে। এই এলাকাটা পেরোলেই ব্যস্ত জীবন কান্নার ঢেউটাকে নিশ্চিহ্ন করে শুষে নেবে। জীবনের হাতে হাত মিলিয়ে মানুষ আবার মৃত্যুকে ভুলবে। চিতার 'পরে আড়াআড়ি সাঁকোর মতো বিন্যস্ত হয়ে থাকা অর্ধদগ্ধ একটা গুঁড়ির তলায় চাক চাক আগুন গলিত লাভাস্রোতের মতো ঝলসাচ্ছে। সেই দিকে তাকাতে তাকাতে দীপ্তেন ভাবছে, পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রামে আমরা ক্রমশ হেরে যাচ্ছি, পিছিয়ে পড়ছি! অনুপম গলায় দড়ি পড়েছে, নীরেনের স্ত্রী রমলা আত্মসম্মানের গলায় ফাঁস লাগিয়ে দত্তসাহেবের ঘেরা-ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মিতার আত্মহত্যার কথা ভেবে, নীতা, রীতা, তপনের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আমি ঝিমিয়ে পড়ছি। ছায়া তুমি যেন ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে, তোমার ছায়ায় কোনো তাপ নেই।

তবুও টের পাই মাঝে মাঝে আমরা হিংস্র নেকড়ে, খ্যাপা কুকুর হয়ে উঠছি আমি, নীরেন, সঞ্জয়, অমিয়, অসিত, দেবব্রত, রতনদা, সবাই। ক্ষুধার্ত সিংহের মতোই আমরা সব ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ছি। কেটলির ভেতরকার ফুটন্ত জলের মতো আমরা ফুটছি। একটা হিংস্রতা, ক্রূরতা আমাদের মধ্যে জোট পাকাচ্ছে, পাকাতে থাকছে। দত্তসাহেব, তুমি আমাদের সঙ্গে হীনমন্যতা নিয়ে কথা বলো না, ভিক্ষুকের মতো কথা কয়ো না। অবহেলা আমরা বেশিদিন সইব না। কারণ জীবনে আমরা অনেক ভুগেছি। কবে আমরা মরিয়া হয়ে তোমার টুঁটি টিপে ধরব। তারপর আদিম মানুষের মতো তোমায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুনে ঝলসে ঝলসে খাব। আর আগুন ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে আমরা নাচব!

চিতাটা এতক্ষণে পুরোপুরি নিভে গেছে। গঙ্গা হতে বয়ে আনা অনেক ঘড়া জল দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করা হয়েছে। এখন ওরা একে একে উঠে দাঁড়াল—সরোজ, দীপ্তেন, কার্তিক, অনন্ত, রবি, বারীন, শান্তিময়—সবাই। তারপর হিমের হাওয়ার ঝাপটা সইতে সইতে জলন্ত চিতার পাশ কাটিয়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা ভেজা কান্নার মাঝ দিয়ে ওরা ধীরে ধীরে এলাকাটা পেরোতে লাগল।

জনৈক পর্যবেক্ষক

মার্কিন দেশে অধিকারের দাবিতে আন্দোলন

['পরিচয়'-এর জন্য লিখিত এই প্রবন্ধটির লেখক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জনৈক মার্কিন ছাত্র ও গবেষক। ফলে স্বভাবতই এই আন্দোলনের যে চিত্র এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তার মূল্য অপরিসীম, ও তার যাথার্থ্য সন্দেহাতীত।—অনুবাদক]

নাগরিক অধিকারের দাবিতে মার্কিন জনসাধারণের সংগ্রাম সংকটকালে এসে দাঁড়িয়েছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, গৃহীত া আলোচ্য আইনসমূহ এবং নাগরিক অধিকারের দাবিতে সংগ্রামরত ংগঠনগুলির ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরে ও দক্ষিণে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো নতুন আশা ও ভরসা পেয়েছেন। তবু সংকটের পশ্চাতে কারণ াছে: অগ্রগতি এসেছে বড় মন্থর পদক্ষেপে, সামান্যতম অগ্রগতির জন্যও বিরাট প্রতিদান দিতে হয়েছে, দক্ষিণ প্রদেশের অভ্যন্তরে এবং উত্তরের াপাত-উদার শহর ও শহরতলীতে আন্দোলনের কর্মীরা বহু অসুবিধার মুখীন হয়েছেন। নিগ্রো-সমাজকে সমানাধিকার, শিক্ষা ও সুযোগ খুলে দিলেই মার্কিন সমাজের উপর সামগ্রিকভাবে গঠনগত ও মৌলিক পরিবর্তন-াধনের দায় এসে পড়তে পারে, এই সম্ভাবনা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

বিগত দশকে, বিশেষত কয়েক বছরে, নাগরিক অধিকারের আন্দোলন ক্ষমতা, প্রসার ও সংগঠনীশক্তি লাভ করেছে। তথাপি মানতে হবে, এই আন্দোলনের সূত্রপাত পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল আগে কৃষ্ণাঙ্গ মাজের অগ্রগতির জন্য জাতীয় সংগঠন (এন. এ. এ. সি. পি) প্রতিষ্ঠার ঙ্গে সঙ্গে। এই আন্দোলনের প্রথম চল্লিশ বছরে নিগ্রো-সমাজ আইনের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সুযোগমাত্র আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর রেও নিগ্রো নাগরিক দক্ষিণাঞ্চলে চূড়ান্ত বৈষম্যের শিকার, উত্তরের হরগুলিতে স্বতন্ত্র বস্তির বাসিন্দা, এবং নিজের দেশের রাজনৈতিক, র্থনৈতিক, সামাজিক, এমনকি ধর্মজীবনেও সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত

হয়ে রইলেন। শাসনতন্ত্রের নির্মাতারা নিগ্রো নাগরিককে নাগরিকত্বের ভগ্নাংশরূপে কল্পনা করেছিলেন; কিন্তু কার্যত নিগ্রো নাগরিককে দাঁড়াতে হল মনুষ্যেতর জীবের পর্যায়ে। রাল্ফ্ এলিসনের ভাষায়, তাঁকে হতে হল "এক অদৃশ্য মানুষ", মানুষ হিসেবে তাঁর অস্তিত্ব রইল না। তাঁদের কৃষ্ণাঙ্গ ভ্রাতারা জীবনে প্রতিদিন যে অপমান ও অন্তর্বেদনা সহ্য করেন, তার খবর মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে পৌছয় না বললেই চলে। কিছু অনুসন্ধিৎসু রিচার্ড রাইট্, জেম্স্ বল্ড্উইন, রাল্ফ্ এলিসন্ প্রমুখ সৃষ্টিশীল লেখক-লেখিকাদের রচনায় নিগ্রো-সমাজের গভীর অন্তর্বেদনার পরিচয় লাভ করেছেন। চারপাশের মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের ঘৃণা, তাঁদের ভালোবাসা, এই লেখকেরা কাব্যময় শৈলীতে বেদনার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

আইনের ক্ষেত্রে এন. এ. এ. সি. পি-র দীর্ঘ আন্দোলনের সার্থকতম পরিণতি আসে ১৯৫৪ সালে। ১৮৯৫ সালে নিগ্রো-সমাজকে "স্বতন্ত্র অথচ সমান" রাখার যে নীতি চালু হয়েছিল, এই বছর সেই নীতির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিলেন—তাঁরা রায় দিলেন, স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা নীতিগতভাবে অসাম্যের দ্যোতক। এই সিদ্ধান্তে গভীর আনন্দের সঞ্চার হয়। অথচ এক দশক পরে দেখা যায়, উত্তরের যে সব শহরে স্বতন্ত্র নিগ্রো-বসতি বর্তমান এবং দক্ষিণের সর্বত্র নিগ্রো ছেলেমেয়েদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায়। যখন দেখি অসংখ্য নিগ্রো ছেলেমেয়ে স্বল্পবিত্ত ক্ষীণপ্রাণ বিদ্যালয়গুলিতে এখনও পড়তে যায়, তখন সেই দৃশ্যের পাশে কেণ্টাকি, টেনেসি, হাণ্ট্স্ভিল্, আলাবামা, অ্যাটলাণ্টা ও জর্জিয়ায় আমাদের জয়লাভের তাৎপর্য ম্লান হয়ে যায়। উত্তরের বহু অঞ্চলে বসতির ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের নীতি স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যত বর্ণবৈষম্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই সব অঞ্চলে এবার বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই মুহূর্তে নিউ ইয়র্ক ও শিকাগোয়, মণ্টগোমরি ও বার্মিংহামের বিদ্যালয়ে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের একত্রে শিক্ষালাভের সুযোগদানের দাবি বলীয়ান হয়ে উঠেছে।

১৯৫৪ সালের পরবর্তী এই কর্মব্যস্ত দশকে নাগরিক অধিকারের সপক্ষে অভিযানরত সংগঠনসমূহ ও শ্রমিকদের এক শক্তিশালী বাহিনী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে দক্ষিণী খৃষ্টীয় নেতৃত্ব সম্মেলন (এস. সি. এল. সি), জেম্স্

ফার্মারের নেতৃত্বে বর্ণসাম্য কংগ্রেস (সি. ও. আর. ই), অহিংস ছাত্র সংযুক্ত কমিটি (জিম ফোরম্যান ও জন লিউইসের নেতৃত্বে এস. এন. সি. সি. বা স্নিক্)। এই সবকটি সংগঠনই অহিংস পন্থায় প্রত্যক্ষ গণ-অভিযানের পক্ষপাতী। এই সংগঠনগুলি সহস্র সহস্র শান্তশিষ্ট ভীরু মানুষ ও নির্লিপ্ত পর্যবেক্ষককে আন্দোলনের পথে নামিয়েছে। এঁরা উদাসীন কলেজ-ছাত্রদের কলেজের গণ্ডির বাইরে এনে ভোটারদের নাম লেখানোর অভিযানে, যানবাহনে বৈষম্যের বিধিভঙ্গের অভিযানে এবং নানা ধরনের সত্যাগ্রহে সামিল করেছেন। ভীত ও সন্ত্রস্ত দক্ষিণী নিগ্রোদের এঁরা ঘর থেকে বের করেছেন, ভোটার হিসেবে নাম লেখানোর লাইনে দাঁড় করিয়েছেন, অর্থনৈতিক বয়কটের আন্দোলনে দাঁড় করিয়েছেন।

আলাবামার মণ্টগোমারিতে মধ্যবয়সিনী জনৈকা নিগ্রো বিধবা রোজা পার্কস্ শ্বেতাঙ্গ যাত্রীকে আসন ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে যে আন্দোলন শুরু করে দেন, তারই পরে এস. সি. এল. সি গঠিত হয়। এই অভিযানের উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ আন্দোলনে আবেগপ্রবণ ও গুণী ধর্মপ্রচারক মার্টিন লুথার কিং নিগ্রো সমাজের অগ্রণী প্রবক্তা ও নেতারূপে সামনে এগিয়ে আসেন। এস. সি. এল. সি-র শাখাপ্রশাখা বর্তমানে সমগ্র দক্ষিণ প্রদেশে ছড়িয়ে গেছে। প্রধানত নিজেদের শাখাপ্রশাখা ও এস্. এন্. সি. সি-র নেতৃত্বে পরিচালিত প্রত্যক্ষ অভিযানেই এই সংগঠনের তহবিল ব্যয়িত হয়।

বর্ণসাম্য কংগ্রেস ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এতাবৎকালের মধ্যে অহিংস গণ অভিযানগুলির জন্য অসংখ্য সংগ্রামী কর্মীকে প্রস্তুত করে তুলেছে। জেম্স্ ফার্মারের নেতৃত্বে 'কোর'-এর কর্মীরা ১৯৬১ সালে দক্ষিণ প্রদেশের অভ্যন্তরে যানবাহনে বর্ণবৈষম্যের বিধি অগ্রাহ্য করে আন্তঃরাজ্য পরিবহন ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্যের নীতিকে আঘাত হেনে ভেঙে দেয়। গত বছর 'কোর'-এর সংগ্রামী কর্মীরা উত্তরের রাজ্যসমূহ ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পসমূহে কর্মী নিয়োগে বর্ণবৈষম্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এঁরা নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেল্ফিয়ায় গৃহনির্মাণ শিল্পে নিগ্রো শ্রমিকদের জন্য কাজ আদায় করে দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমানাধিকার ও সমান সুযোগের সপক্ষে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও যুক্তিনির্ভর বক্তাদের মধ্যে ফার্মার অন্যতম।

১৯৬০ সালে উত্তর ক্যারোলিনায় গ্রীন্স্বরোয় ছাত্রেরা যে অবস্থান ধর্মঘট

শুরু করেন, তা অচিরেই সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। এই অভিযানের মধ্যেই কয়েকজন সংগঠক কর্মকর্তা ও ছাত্রকর্মীদের নিয়ে গঠিত এস্. এন্. সি. সি নামে সংগ্রামী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এই অভিযানগুলির পরেই ছাত্রেরা স্থির করেন যে, তাঁদের সংগঠন দক্ষিণ প্রদেশের সবচেয়ে গোঁড়া অঞ্চলগুলিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর অভিযানের পথ নেবেন। আঠারো-উনিশ থেকে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ছাত্রেরা এস্. এন্. সি. সি কর্মীরূপে ন্যূনতম মাসোহারার বিনিময়ে কিংবা সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত আহার্যের দানে নির্ভর করে দক্ষিণ-পশ্চিম জর্জিয়া, মিসিসিপির বদ্বীপ অঞ্চলে; আলাবামার কৃষ্ণাঙ্গপ্রধান অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে নির্লিপ্ত ও পরপদানত দক্ষিণী নিগ্রোদের ভোটাধিকারের দাবিতে ঘরের বাইরে টেনে আনেন। মিসিসিপি ও আলাবামায় ভোটাধিকারের যোগ্যতাবিশিষ্ট নিগ্রোদের মধ্যে বোধহয় শতকরা দুই বা তিন ভাগ মাত্র ভোটারতালিকায় স্থান পেয়েছেন। অথচ শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে শতকরা ষাট ভাগ বা আরো বেশি এই অধিকার লাভ করেছেন। এই রাজ্যগুলির অনেক জেলায় নিগ্রোরা জনসমষ্টির অর্ধেকেরও অধিক, এবং সেই হেতু বিপুল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনাও তাঁদের হাতে।

এস্. এন্. সি. সি কর্মীরা নিগ্রো-সমাজের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আশা ফিরিয়ে আনবার প্রয়াসে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। অথচ এই সব অঞ্চলে আসল লাভ বলতে সামান্যই হয়েছে। রাজ্য-শাসকমণ্ডলী, স্থানীয় রাজনীতিবিদেরা, পুলিশবাহিনী ও ফ্যাশিস্ট গুণ্ডারা বহুযুগ ধরে আপন মর্জিমাফিক যেখানে দাপটে রাজ্য চালিয়েছে, সেখানে একদিনেই পরিবর্তন আশা করা যায় না। "শ্বেতাঙ্গ শক্তির শক্তিস্তম্ভের" বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে এস্. এন্. সি. সি কর্মীদের জেলে যেতে হয়েছে, মার খেতে হয়েছে, গুলি খেতে হয়েছে। আশ্চর্য শৌর্যের জোরেই তাঁরা ময়দানে অনড় থেকেছেন। স্থানীয় দক্ষিণী কর্তারা নাগরিক অধিকারের দাবিতে অভিযানরত কর্মীদের মার লাগিয়েছে, আর এফ. বি. আই নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। স্নিক্‌নিক্‌রা কাজ করছেন এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়ায়, আইন তাঁদের আশ্রয় দেয় না, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কোনো শাসকমণ্ডলীই তাঁদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে না। তাঁরা একা নিঃসহায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

চতুর্থ যে সংগঠনটি গত কয়েক বছরে এগিয়ে এসেছে, তাদের নাম কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়। কেবলমাত্র নিগ্রোদের এই সংগঠনটিতে সদস্যেরা শ্বেতাঙ্গদের

ধর্ম বলে ঘোষণা করে খৃষ্টধর্মকে ত্যাগ করে এক বিচিত্র মুসলিম ধর্মনীতি গ্রহণ করেছেন। এই ধর্মনীতির শিক্ষা, সকল শ্বেতাঙ্গই মূর্তিমান পাপ; তাই নিগ্রো তাঁর প্রাপ্য সমানাধিকার পেতে পারেন কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গবিহীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে। এই মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা সুকঠোর এক নীতিতন্ত্র অনুসরণ করেন, এবং এঁরা নিজেদের দোকানপাট ও সমবায় প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করেছেন। অপরাধপ্রবণ নিগ্রোদের সুনীতির কঠোর শাসনের আওতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় এঁরা উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। এঁদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিকে প্রায় কেউই আমল দেন না, কিন্তু মার্কিন নিগ্রোর উপর শ্বেতাঙ্গশ্রেণী এমনকি ধর্মের নামেও যে উৎপীড়ন চালিয়েছে, তার তিক্ত কাহিনী এঁরা যখন তুলে ধরেন, তখন অনেকেই কান পেতে শোনেন। সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গশ্রেণীর সুযোগ-সুবিধার তুলনায় নিগ্রো-সমাজ আন্দোলনের দ্বারা যেটুকু লাভ করেছেন, তার সামান্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এঁরা অন্যান্য সংগঠনগুলিকে দীর্ঘসূত্রতার পর্যায়ক্রমিক নীতি ছেড়ে বলিষ্ঠতর নীতির দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি এই সম্প্রদায়ের প্রধান মুখপাত্র ও অন্যতম নেতা দশম ম্যাল্‌কম্ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি এক কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান সমাজের ধর্মীয় সংস্কারগুলির কয়েকটি বর্জন করে অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রয়াসের আহ্বান জানিয়েছেন।

নাগরিক অধিকার আন্দোলন গত দশ বছরে অধিকতর শক্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই দু-ভাবে প্রসার লাভ করেছে। প্রথমত, এই আন্দোলন দক্ষিণের সীমিত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উত্তরাঞ্চলের অভিযানসমূহে তার শক্তিকে চালিত করেছে। উত্তরাঞ্চলে বর্ণবৈষম্য আরো জটিল আকারে প্রায়শই লুকিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের ক্ষেত্র স্কুল-কলেজ বা খাবারের দোকান ছাড়িয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের সামগ্রিক চক্রে মিশে গেছে। এই দুই ভাবে প্রসারের ফলে বৃহত্তর সংখ্যায় সক্রিয় যোগদানে আন্দোলনের লোকবল বৃদ্ধি পেয়েছে, আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু এতগুলি বিভিন্নধর্মী সংগঠনের আবির্ভাব এবং নীতি ও প্রভাবক্ষেত্রের প্রশ্নে এদের বিরোধ-হেতু সংগঠনগুলি আরো চিন্তাসমৃদ্ধ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, কর্মপ্রয়াসে গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি করেছে।

এই জাতীয় সমবেত প্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গত অগস্ট মাসে ২০০,০০০ মানুষের ওয়াশিংটন অভিযান। এই শোভাযাত্রীরা ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখে সমবেত হয়ে কন্‌স্টিটিউশন অ্যাভিনিউ ধরে পদযাত্রা করে লিঙ্কন্ স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে পৌঁছয়। সবকটি সংগঠনই এই অভিযানের পরিচালনায় একত্রে কাজ করে, সবকটি সংগঠনের নেতাই সমবেত জনতার কাছে ভাষণ দান করেন। সেদিন অনেকেই বক্তৃতা করেন, গান করেন। কিন্তু রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং সমগ্র জনতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে ঘোষণা করেন: "যেদিন আমরা স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজিয়ে দেব, যেদিন তার ধ্বনি প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হবে, সেদিন জানব, সেই দিন সমাসন্ন, যেদিন ঈশ্বরের সকল সন্তান, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ, ইহুদী খৃষ্টান, প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিক, হাতে হাত ধরে সেই পুরনো নিগ্রো ধর্মসঙ্গীতের কথাগুলি গেয়ে উঠবে:

এতকাল পরে মুক্ত,
এতকাল পরে মুক্ত,
ঈশ্বর, ধন্যবাদ,
আমরা এতকাল পরে মুক্ত।" *

আগে কখনো মিসিসিপির বাইরে আসেননি এমন এক নিগ্রো মহিলা সেদিন বলেন যে, এর আগে কোনোদিন কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষের কাছে তিনি সৌজন্য পাননি।

কিন্তু এই একটি দিনের ঘনিষ্ঠ তাপ ও সৌহার্দ্য আমাদের কিছুটা বিমূঢ় করে দেয়। আমরা ভুলে যাই যে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর অভিযান এই তো সবে শুরু, এই শোভাযাত্রা যেন হিসেব মিলিয়ে নেব বলে ক্ষণেকের বিরাম। মাত্র

* When you let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing, in the words of the old Negro spiritual,

Free at last,
Free at last.
Thank God Almighty,
We are free at last.

কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আলাবামার বার্মিংহামে এক নিগ্রো গীর্জায় বোমা পড়ল, চারটি নিগ্রো মেয়ে মারা গেল, সেইদিনই কৃষ্ণাঙ্গপ্রধান অঞ্চলের সেই অন্তরহীন অন্তরে আরো দুটি নিগ্রো যুবক আততায়ীর গুলিতে মারা গেল।

তার পরের কয়েকটি মাস ধরে অভিযান আবার শক্তি সংগ্রহ করে চলল। নিউ ইয়র্ক ও শিকাগোয় বৈষম্যভিত্তিক বিদ্যালয় নীতির বিরুদ্ধে বিদ্যালয়সমূহে পূর্ণ ধর্মঘট হ'ল। এই দুটি শহরের প্রত্যেকটিতেই ১০০,০০০-এর অধিক ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট করে। নিউ ইয়র্ক স্কুল বোর্ড বর্তমানে একজাতিক বিদ্যালয় বর্জন করার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা রচনার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু শিকাগোয় অভিযানের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে অনড় অটল স্কুল বোর্ড এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা।

এস্. এন্. সি. সি ও এস্. সি. এল্. সি দক্ষিণ প্রদেশে তাঁদের প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, উত্তরে নিগ্রোদের চাকুরীর দাবিতে 'কোর' তাঁদের চাপ বজায় রেখেছেন। এই বছর সংগঠনগুলি অধিকতর ও দ্রুততর অগ্রগতির দাবিতে আরো গণঅভিযানের পথে নামবেন।

সামনে বিপদ আছে। নিগ্রো বেকারী হ্রাসের চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারসহ সরকারী সংগঠনসমূহ এবং নাগরিক অধিকাররক্ষা সংস্থাগুলি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। নিগ্রো বেকারীর ভার এখনও শ্বেতাঙ্গশ্রেণীতে বেকারীর (শতকরা ৫.৬ ভাগ) দ্বিগুণ। বৈষম্যমুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য আন্দোলন ও ভোটাধিকারলাভের অভিযানেও নামমাত্র অগ্রগতি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, নিগ্রোদের সমস্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্রতম শ্রেণীর সমস্যারই আরেক বৃহত্তর রূপ।

নিগ্রোরা সবচেয়ে স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিক। তাই স্বভাবতই স্বয়ংক্রিয়তা প্রবর্তনে ও লে-অফ্ বা সাময়িক বরখাস্তে এঁরাই সবার আগে মার খান। স্বল্পদক্ষ বেকার নিগ্রো শ্রমিকের কর্মসন্ধানের প্রশ্ন আজ স্বয়ংক্রিয়তার পথে দ্রুত অগ্রসরমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নমনশীলতা, বিকাশসম্ভাবনা, ও কর্মসুযোগের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মৌলিক সন্দেহের মধ্যে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে। অদক্ষ শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরাও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু সামাজিক শ্রেণীরূপে নিগ্রোরা আরো বেশি ভুগছেন, কেননা, বর্ণবৈষম্যের খড়্গ তাঁদের বিরুদ্ধে সদা উদ্যত। নিগ্রোরা যে কী পাপচক্রে পড়েছেন,

তারই প্রমাণ। তাঁরা যতদিন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা পাবেন, ততদিন তাঁরা চাকুরীর বাজারে অধিকতর শিক্ষিত শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়েই থাকবেন। নিগ্রোদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপুল উন্নতি এবং তাঁদের কর্মপ্রাপ্তির সুযোগবৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। সেক্ষেত্রেও এই মুহূর্তে জীবিত স্বল্প-শিক্ষিত নিগ্রোশ্রেণী তথা প্রাপ্ত বয়স্কদের বৃহত্তর অংশ মার্কিন নাগরিককুলের দরিদ্রতম শ্রেণীরূপে তাঁদের জীবন কাটিয়ে দেবার দায় থেকে কিছুতেই মুক্তি পাবেন না। অবশ্য একথা উল্লেখ্য যে, অদক্ষদের শিক্ষাদান ও দরিদ্রদের সাহায্য দানের একটি অপর্যাপ্ত সরকারী পরিকল্পনা রাষ্ট্রপতি জন্‌সন্ প্রস্তাব করেছেন। এ যেন মরুপ্রান্তরে জলবিন্দু। এ পথে আশু কোনো পরিবর্তন আসবে না। দি 'আর্বান লীগ' নামে একটি নিগ্রো সংগঠন তাঁদের পরিচালক হুইট্‌নি ইয়ং-এর নেতৃত্বে প্রস্তাব করেছেন যে, নিগ্রো সমাজকে অনুন্নত জাতি বলে বিবেচনা করা হোক এবং তাঁদের জন্য বিশেষ সরকারী সহায়তা ও শিক্ষার ব্যবস্থা হোক। এই প্রস্তাবটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে এখন আলোচনা চলছে।

অন্যদিকে মার্কিন বর্ণবিরোধের ক্ষেত্রে হিংসাত্মক নীতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই আশঙ্কা দক্ষিণাঞ্চলের অভ্যন্তরে এবং নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেল্‌ফিয়া ও ওয়াশিংটনের স্বতন্ত্র নিগ্রো বসতি অঞ্চলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণীশ্রেণী ও স্থানীয় পুলিশের সংগঠিত পাশবিকতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র নিগ্রো প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন নৌবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক ও এন্. এ. এ. সি. পি-র প্রাক্তন শাখা-সভাপতি রবার্ট উইলিয়ম্‌স্। উত্তর ক্যারোলিনার মাল্‌রোয় উইলিয়ম্‌স্ নিগ্রোদের অস্ত্র যোগান, তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা দেন। তাঁদের উপর শ্বেতাঙ্গেরা গুলি চালালে, তাঁরা গুলিতে জবাব দেন। অল্পকাল পরেই উইলিয়ম্‌স্ সহ অন্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশ কিড্‌ন্যাপিং-এর অভিযোগে একটি সাজানো মামলা ঠুকে দেয়। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়, তাঁরা সকলেই পলায়ন করেন। কিন্তু অনেকেই পরে ধরা পড়েন, আজ তাঁরা মাল্‌রোয় মৃত্যুদণ্ডের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। রবার্ট উইলিয়ম্‌স্ প্রথমে ক্যানাডা ও পরে সেখান থেকে কিউবায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। উইলিয়ম্‌স্ কিউবাতেই রয়ে গেছেন। তিনি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য প্রচারিত 'রেডিও ফ্রী ডিক্‌সি' অনুষ্ঠানের পরিচালক।

সম্প্রতিকালে বিশিষ্টতর নিগ্রো নেতা কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়ের পূর্বতন প্রধান প্রবক্তা দশম ম্যালকম নিগ্রোদের আত্মরক্ষার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন: "যে মানুষ অবিরত পাশবিক আক্রমণের শিকার, তাকে আত্মরক্ষা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেওয়া অপরাধ। হাতের কাছে একটি শট্‌গান বা রাইফেল রাখা আইনানুগ। যে সব অঞ্চলে পাশবিকতার হাত থেকে নিগ্রোদের রক্ষা করতে সরকার অনিচ্ছুক বা অপারগ, সেখানে আমাদের কর্তব্য রাইফেল-ক্লাব গঠন করে আপৎকালে নিজেদের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করা। আমাদের লোককে যখন কুকুরে এসে কামড়ায়, তখন সেই কুকুরকে বধ করার অধিকারও আমাদের আছে।"

উপরোক্ত সংগঠনগুলি এজাতীয় হিংসাত্মক নীতি এড়িয়ে চলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। হিংসার পথে উন্নতি আসবে না, হয়তো কেবল কঠিনতর বিরোধই আসবে। প্রতিনিধি সংসদে অনুমোদিত অথচ সেনেটে দক্ষিণীদের বিরোধিতায় বাধাপ্রাপ্ত নাগরিক অধিকার বিলটিকে অনুমোদনদানের দাবিতে এঁরা গলা মেলাচ্ছেন।* কিন্তু শুধু আইন যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীকে এই আইনকে দৃঢ়সঙ্কল্পে দ্রুততার সঙ্গে কর্মে রূপ দিতে হবে। সম্প্রতি মার্টিন লুথার কিং ও এস্. এন্. সি. সি-র উপদেষ্টা হাওয়ার্ড জিন্ দাবি জানিয়েছেন যে, দক্ষিণাঞ্চলে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে যোগদানকারীদের রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জনসন্ কী ভাবে এই সংকটের সম্মুখীন হবেন, তা-ই দেখবে বলে সবাই অপেক্ষারত। এই সহায়তাদান ও দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের ভোটার হিসেবে নাম লিপিবদ্ধ করবার সুযোগ দিতে হবে, এই দাবিতে স্থিরনিশ্চয় পদক্ষেপ করবার আইনগত অধিকার তাঁর হাতে আছে। যদি কংগ্রেস ও নাগরিক অধিকার সংস্থাগুলি তাদের ভূমিকা পালন করে, শাসন-কর্তৃপক্ষকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। সকল শক্তির এই সমবেত প্রয়াসেই আমরা এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারি। জেম্‌স্ বল্‌ড্‌উইন্ এই চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছেন: "বর্ণসাম্যের যদি কোনো অর্থ থাকে, তবে তার অর্থ এই: ভালোবাসার শক্তিতে আমরা আমাদের ভ্রাতাদের দৃষ্টির আবরণ উন্মুক্ত করে তাদের আপন সত্তাকে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত

* আইনটি সম্প্রতি পাশ হয়েছে।

করে তুলব, বাস্তব থেকে পলায়ন করব না, তার পরিবর্তন শুরু করে দেব। মার্কিনীরা কবে প্রাপ্তবয়সী হয়ে উঠে উপলব্ধি করবে যে আমরা তাদের শত্রু নই, সেইদিনের জন্য হাতে টুপি ধরে এতদিন অপেক্ষা করে থাকা, এ বড় ক্লান্তিকর। নিগ্রোই আজ এ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তার ভবিষ্যৎ আলোকদীপ্ত হবে কি অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থাকবে, এই প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপরেই মার্কিন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। শহরে গ্রামে, আইনের চোখে, মনের গভীরে কৃষ্ণাঙ্গের পূর্ণ মুক্তিকে স্বীকার করেই শ্বেতাঙ্গ জনতা তাদের নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারবে। এই মুহূর্তেই সামনে সেই চ্যালেঞ্জ। কাল নিরবধি বর্তমান।" *

অনুবাদ : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

* And if the word *integration* means anything, this is what it means : that we with love, shall force our brothers to see themselves as they are, to cease fleeing from reality and begin to change it.

It is galling to have stood so long, hat in hand, waiting for Americans to grow up enough to realise that you do not threaten them.

He (the Negro) is the key figure in this country, and the American future is precisely as bright or as dark as his.

The price of the liberation of the white people is the liberation of the blacks—the total liberation, in the cities, in the towns, before the law, and in the mind.

The challenge is the moment, the time is always now.

পুস্তক-পরিচয়

Bengali Folk-Ballads from Maimansing and the Problem of Their Authenticity : Dr. Dusan Zbavitel. University of Calcutta : 1963 : Rs. 12.00.

ডক্টর দুশান্ জ্‌বাভিতেল্ চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাচ্যবিদ্যা ইন্‌স্টিট্যুটের ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ। বহুকাল ধরে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় রত রয়েছেন। বহু বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি তিনি তাঁর মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন। চেক্ ভাষার তিনি একজন জনপ্রিয় লেখকও বটেন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে একবার শ্রীজ্‌বাভিতেল্ বলেন যে, তিনি নিজেকে একজন বাঙ্গালী বলেই মনে করেন, এবং শুধু তাই নয়, তিনি মৈমনসিংহ গীতিকার মাধুর্যে এতই মুগ্ধ যে নিজেকে তাঁর মৈমনসিংহের বাঙ্গাল বলে ভাবতে ভালো লাগে। কথাটির আন্তরিকতা বক্তৃতা-সভার সভাপতি এমনকি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মশায়েরও হৃদয় স্পর্শ করেছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রীজ্‌বাভিতেলের অন্তরের সুগভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। যে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার সঙ্গে মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা তিনি পরীক্ষা করেছেন তার জন্য বাংলা সাহিত্য-সেবীদের শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ তাঁর অবশ্য প্রাপ্য। প্রসঙ্গত শ্রীজ্‌বাভিতেলের দেশবাসী আরেকজন মনীষীর কথা মনে পড়ছে—তিনি ভিণ্টারনিৎস্। বলতে দ্বিধা নেই—শ্রীজ্‌বাভিতেল্, ভিণ্টারনিৎসের যোগ্য উত্তরসূরী।

আলোচ্য পুস্তকটির ভূমিকায় শ্রীজ্‌বাভিতেল্ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের সংশয় ও তার ফলে মৈমনসিংহ গীতিকার যথোপযুক্ত মূল্যায়নে সমালোচকমহলে দ্বিধা শ্রীজ্‌বাভিতেলের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। হয় কেউ প্রমাণ করুন যে মৈমনসিংহ গীতিকা একটা বড়োরকমের ধাপ্পাবাজী আর না হয় সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করুন যে বাংলা সাহিত্যের এই গ্রামীণ সম্পদ খাঁটি এবং নির্ভেজাল। শ্রীজ্‌বাভিতেল্

মনে করেন যে দুটোর কোনোটাই করা হয় নি। উভয় পক্ষই অস্পষ্ট, ভাসাভাসা, ধোঁয়াটে যুক্তি অল্পস্বল্প তুলে নীরব হয়েছেন। ফলে বাংলার লোকজীবন থেকে আহৃত এই পরম মূল্যবান কাব্যৈশ্বর্য অবহেলিত হয়েছে এতদিন ধরে। শ্রীজ্‌বাভিতেলের এই বক্তব্যের সত্যতায় কোনো আপত্তি তো উঠতেই পারে না বরং শোচনীয়ভাবে বাংলা সাহিত্যসেবীদের বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদগুলির প্রতি ঔদাসীন্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের ঋণ অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস বড়ো একটা দেখা যায় না কিন্তু অবহেলিত চন্দ্রকুমার দেকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার সাহস অনেকেরই আছে, জানি। কিন্তু গভীর ভালোবাসা, পরিপক্ব রসবোধ এবং বিশ্লেষণক্ষমতা প্রয়োগ করে চন্দ্রকুমার দের সারাজীবনের সাধনাকে উপযুক্ত সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এমন একজন বঙ্গসাহিত্যপ্রেমিক পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, এ সত্যই আনন্দের কথা।

শ্রীজ্‌বাভিতেল অবশ্য মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হন নি, উপযুক্ত সমালোচনা ও বিশ্লেষণের দ্বারা এই গীতিকাসমূহের পরিপূর্ণ সমাদরেও অগ্রণী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বিষয়টিকে প্রাঞ্জলভাবে সমাধান করেছেন। কোথায় নিহিত রয়েছে মৈমনসিংহ গীতিকার বিশিষ্ট সৌন্দর্য, কোন কোন বিশিষ্ট গুণ এদের উৎকর্ষের উৎস, তা দেখাতে গিয়ে শ্রীজ্‌বাভিতেল্ গীতিকাগুলিকে একটি একটি করে করে বিশ্লেষণ করেছেন। এই গীতিকাগুলির প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার পর এগুলির উপর ভিত্তি করে তিনি লোককাব্যের নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে তিন ধরনের অভিমত লক্ষ্য করেছেন লেখক। কেউ কেউ এই গীতিকাগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবেই সন্দিহান। এঁরা এগুলিকে কোনোরকম স্বীকৃতিই দিতে চান না। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে হয়তো গীতিকাগুলি মূলত খাঁটিই, কিন্তু এতে নানারকম ভাবে হস্তক্ষেপ করে অনেক অদলবদল করা হয়েছে। তৃতীয় আরেক দলের মতানুযায়ী গীতিকাসমূহ পুরোপুরি লোকসাহিত্যের নিদর্শন এবং এগুলোর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল করা হয় নি। গ্রন্থকার প্রথম দলে কবি জসীমুদ্দিন ও নন্দগোপাল সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের প্রতিপক্ষ হিসাবে তৃতীয় দলে তিনি উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক আশুতোষ

ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মৈমনসিংহের রওশন ইয়াজদানী ও চিত্তরঞ্জন দেবকে। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা যে-যে কারণে সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই কারণগুলিকে লেখক আলোচনার সুবিধার জন্যে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রথমত, এখন মৈমনসিংহে এই সব গীতিকার কোনো নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, গীতিকার ভাষা ও মৈমনসিংহে প্রচলিত উপভাষা বিভিন্ন। গীতিকাসমূহে প্রায় আগাগোড়া সাধুভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয়ত, বিষয়ের দিক থেকে গীতিকাসমূহ ধর্মনিরপেক্ষ, রোমান্টিক এবং রং-চড়ানো।

১৯৬০ সালের শরৎকালে ইউনেস্কো থেকে একটি বৃত্তিলাভ করে শ্রীজ্‌বাভিতেল্ তিন মাস ধরে পূর্ব-মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চলে ঘুরেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন কবি জসীমুদ্দিন। এবং তাঁরাও মৈমনসিংহ গীতিকার কোনো নিদর্শন খুঁজে পান নি। তথাপি শ্রীজ্‌বাভিতেল্ গীতিকাগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়ী। কারণ, ঐ বিশিষ্ট আঙ্গিকে গীতিকাসমূহের অবলুপ্তি তাঁর মতে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে এরকম না ঘটাই অস্বাভাবিক। পরিবেশ এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রভাবেই এরকম ঘটে থাকে। গীতিকাসমূহ সংগ্রহের আগেই মৈমনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকায় ১৯১৪ সালের এপ্রিল-মে সংখ্যায় চন্দ্রকুমার দে গীতিকাসমূহের দ্রুত অবলুপ্তির বিষয়ে জানিয়েছিলেন। তাছাড়া, ছেলেবেলায় এই গীতিকাগুলি যাঁরা মৈমনসিংহের পল্লী অঞ্চলে স্বকর্ণে শুনেছেন, যথা—আজহারউল ইসলাম, রওশন ইয়াজদানী, জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি সাহিত্য-সেবীদের সাক্ষ্যও উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। গীতিকাসমূহের প্রকাশকালে মৈমনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকায় যাঁরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, যথা—সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, তারিণীকান্ত মজুমদার, সুধাংশুভূষণ রায় প্রভৃতি কেউই গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন নি, যদিও তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে চন্দ্রকুমার দেকে সমালোচনা করেছিলেন। একা চন্দ্রকুমার নন, নগেন্দ্রচন্দ্র দে এবং বিহারীলাল রায়ও কয়েকটি গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন। এতদ্ভিন্ন, গীতিকা আকারে দুর্লভ হলেও গীতিকার গল্পগুলি এখনও 'কিস্‌সা', 'লম্বাগীত' ইত্যাদি আকারে প্রচলিত আছে।

ভাষার দিক থেকে অধ্যাপক সুকুমার সেন গীতিকাগুলি সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলেছেন সে প্রসঙ্গে শ্রীজ্‌বাভিতেল্ মনে করেন—মৈমনসিংহের

আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে গীতিকার ভাষার মিল না থাকা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। চন্দ্রকুমার দে, এমনকি, দীনেশচন্দ্র স্বয়ং মৈমনসিংহের ভাষা অবিকৃত ভাবে ছাপার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। তাছাড়া লোক-কবিরা উপভাষায়ই বা কেন কবিতা রচনা করতে যাবেন যদি তাঁরা সাধু ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হন? সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলে, গ্রামাঞ্চলে কবির এবং কাব্যের মর্যাদা বাড়ে—এতো জানা কথা। পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কাব্যরচনায় সাধু ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে সন্দেহের কি কারণ থাকতে পারে? মৈমনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যত্র থেকে সংগৃহীত লোকসাহিত্যের অজস্র নিদর্শনের মধ্যে সাধু ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। বিষয়ের দিক থেকে এবং উচ্চতর আঙ্গিকের দিক থেকে যে সব আপত্তি উঠেছে সে সম্বন্ধে শ্রীজ্‌বাভিতেল্‌ স্পষ্টতঃ পৃথক মানদণ্ড ব্যবহারের পক্ষপাতী। হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সাহিত্যের গণ্ডীর বাইরে মুসলমান সাহিত্যের প্রভাবে পুষ্ট লোক-সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড এবং ঐতিহ্যানুসারী সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড এক হতে পারে না বলেই লেখকের ধারণা। ধর্মীয় অনুশাসন ও সমর্থনের মুখাপেক্ষী ছিলেন না বলেই লোককবিরা বিষয়ের দিক থেকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেখাতে পেরেছেন। মুসলমানী ঐতিহ্যের প্রেমগীতির প্রভাবকে তাই লোকজীবনে প্রতিফলিত করা লোক-কবিদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

শ্রীজ্‌বাভিতেলের পুস্তকটি চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে তিনি গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে গীতিকাসমূহের বিষয় ও রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অংশটিই সর্ববৃহৎ। এতে তাঁর আলোচ্য বিষয় হল গীতিকাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি, যথা—গীতিকার কবিদের মতাদর্শ ও কলাদর্শ; হিন্দু ও মুসলমান ভাবনার মিশ্রণ; গীতিকাসমূহের রচয়িতাবৃন্দ; প্রকৃতি ও বারোমাসী; নীতি, চিন্তা ও ভণিতা; ছন্দ। চতুর্থ অংশে লেখক উপমা ও অন্যান্য অলঙ্কারের কাব্যসৌন্দর্য নির্ণয় করেছেন। স্বল্পপরিসর আলোচনায় সমগ্র পুস্তকটির প্রতি, অতএব, সুবিচার অসম্ভব।

মৈমনসিংহ গীতিকার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যে সব কারণে সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সেই কারণগুলি শ্রীজ্‌বাভিতেল্‌ সম্পূর্ণ দূর করতে পেরেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে গীতিকাসমূহের কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণে ও

তাদের সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ে তিনি যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন সেগুলি অবশ্যই আরো আলোচনার অপেক্ষা রাখে। একজন মহাপ্রাণ বিদেশী উদ্যোগী হয়ে যে পথনির্দেশ করেছেন, আশা করব, আরো অনেকে উৎসাহের সঙ্গে সেই নির্দেশ গ্রহণ করে লোকসাহিত্যের সমাদরে ও সংরক্ষণে অগ্রণী হবেন।

অনিমেষ পাল

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। ছ' টাকা।

রামমোহন ভারত-পথিক। রামমোহন উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রবর্তক। সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে আন্দোলন, কৃষকের খাজনার হার বেঁধে দেবার দাবি, কোম্পানীর নুনের একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর মধ্যে এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবান মানুষের বহুমুখী কর্মজীবনের পরিচয় মেলে। দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি বরাবর চেষ্টা করে গেছেন। সেই বিষণ্ণ যুগে দীপ্ত সূর্যের মতো তাঁর আবির্ভাব। "ভারতবর্ষের জীবনে নব জাগরণের ও নব বসন্তের সব সম্ভাবনা" তিনি বহন করে এনেছিলেন। উনিশ শতকের ভারতের ইতিহাসে রামমোহনের প্রগতিশীল ভূমিকা তর্কাতীত। কিন্তু তিনি কি ভারতে শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন? তাঁর যুগে এদেশে শিল্প-বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা ছিল?

আলোচ্য বই-এর শিরোনামা চমকপ্রদ। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিপাদ্য বিষয়, রামমোহন ও দ্বারকানাথ ভারতে শিল্প-বিপ্লব, তথা "বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার জন্য" এগিয়ে এসেছিলেন। শ্রীঠাকুরের বক্তব্যের সারাংশ আমরা উপস্থিত করবো। রামমোহনের যুগে ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হচ্ছিল। কোম্পানী এবং দেশী জমিদার শ্রেণী ছিলেন এই একচেটিয়া অধিকারের পক্ষে, আর উদীয়মান উদারনৈতিক শ্রেণী ছিলেন অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে। রামমোহন ও দ্বারকানাথ উদারনৈতিক শ্রেণীর দাবিকেই দেশের প্রগতির সহায়ক বলে স্বাগত জানিয়েছেন। শ্রী ঠাকুর লিখেছেন "নতুন নতুন ব্যবসা পত্তন করে ও

নতুন নতুন কাঁচা মাল উৎপন্ন করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মরা গাঙে বান আনতে হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বাঁধ ভেঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের স্রোত বইয়ে দেওয়া ছাড়া সে দিনের বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় আর কোন পথ ছিল না"। (পৃঃ ২২) ভারতে ইংলণ্ডের ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখক বলেন, "বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো ভেঙে সেখানে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সম্ভবনা ঘটাবে ইংলণ্ড—এই ছিল সে যুগের ইতিহাসের নির্দেশ।" (পৃঃ ২৪) কোম্পানীর পক্ষ নিয়ে একদল ইংরাজ ও দেশী জমিদার সমসাময়িক সংবাদপত্রে আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী 'জন বুল'-এ প্রকাশিত ভেরিটাসের চিঠিখানি বেশ উপভোগ্য : "ব্রিটিশ কৌশল? সেটা কি বস্তু? এ দেশবাসীকে কৌশলে ঠকিয়ে যাতে টাকা নেওয়া যায় তারই নাম 'ব্রিটিশ কৌশল'। 'ব্রিটিশ মূলধন' কি? কেন, একটিও টাকা না নিয়ে ভারতে এসে একটি এজেন্সী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং বেপরোয়া ভাবে ধার করা।" (পৃঃ ৩১) রামমোহন ও দ্বারকানাথ ভিন্ন মত পোষণ করতেন, এঁরা ছিলেন অবাধ-বাণিজ্য নীতির স্বপক্ষে। দ্বারকানাথের মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ইংরাজদের সংস্পর্শে এসে "শিক্ষার ও চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করেছে," অপরদিকে গ্রামদেশে যেখানে জমিদাররা জাঁকিয়ে আছেন, সেখানে "অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য ব্যতীত আর কিছু নেই।" (পৃঃ ৫৮) দেশে তখন নীল চাষ প্রসারিত হচ্ছে। নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও, "চাষীদের অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে।" শ্রীঠাকুর দ্বারকানাথ ও রামমোহনের নীল চাষ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। (পৃঃ ৭৭-৭৮) দ্বারকানাথ শহর কলকাতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—এখানে জীবিকার নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত; রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, স্বর্ণকার ও দরজীর মজুরির হার বৃদ্ধির মুখে; নৌকোর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাঝিদের অবস্থা উন্নত; কাপড়ের কম দরের দরুণ দরিদ্র শ্রেণী কাপড় কিনতে পারে। (পৃঃ ৮৮-৮৯) অবশেষে শ্রীঠাকুর মন্তব্য করেছেন, "ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লব ঘটাতে হবে, পুরনো উৎপাদন-প্রণালীকে বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় কলকারখানা বসিয়ে নানা ধরনের জিনিস ও শস্তা জিনিস উৎপন্ন করতে হবে। এইটেই ছিল সেই যুগের ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্ম। তাই সেটা ধলা আদমী দিয়ে হোক কিম্বা কালা আদমী দিয়ে হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।…অতি

সচেতনভাবে এই শিল্প-বিপ্লব ঘটাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দ্বারকানাথ ও রামমোহন"। (পৃঃ ৯০) শ্রীঠাকুরের মতে "তাই ইংরাজের সহযোগিতায় ভারতের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার জন্য দুটি অসামান্য পুরুষ সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন—রামমোহন ও দ্বারকানাথ।" (পৃঃ ১১৪)

শ্রীঠাকুরের মতামত অভিনব, কিন্তু তর্কাতীত নয়। তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি দুর্বল। প্রথমত, রামমোহন-দ্বারকানাথের যুগে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার কোনো সম্ভাবনা ছিল কি? তখন দেশে বুর্জোয়া বা শ্রমিকশ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে নি। প্রধানত জমিদারি-জোতদারি প্রথার গর্ভে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম, তার নেতৃত্বে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব ঘটবার কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া "ইংরেজের সহযোগিতায়" ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক বিপ্লব ঘটবার কোনো নজির ইতিহাসে আছে বলে আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, সে যুগে শিল্প-বিপ্লব ঘটবার সম্ভাবনা ছিল কি? তখন বাংলার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছে (১৭৯৩)। পুরনো বণিক শ্রেণী বাণিজ্য ছেড়ে বা বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে ঝুঁকেছেন জমির নিরাপদ আয়ের দিকে। বাংলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তখন এজেন্সী হাউসগুলির মুঠির মধ্যে। শিল্প-বিপ্লব ফাঁকা কথা নয়, শিল্প-বিপ্লব বলতে বোঝায় উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তর। রামমোহনের যুগের বিশেষ অবস্থায় উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তর সম্ভব ছিল? রামমোহন কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে গেছেন। ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট পাশ হবার পরে এদেশে অবাধ-বাণিজ্য নীতি চালু হল। 'ফ্রি ট্রেড ক্যাপিটালিজম'-এর যুগে এদেশে শিল্পায়ন ঘটেছে সত্য, কিন্তু তার গতি ছিল মন্থর এবং সে পর্বেও "ইংরাজের সহযোগিতায়" শিল্প-বিপ্লব ঘটে নি। তৃতীয়ত, রামমোহন কি স্বয়ং এদেশে শিল্প-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন দ্বারকানাথ। বইটির অর্ধাংশ জুড়ে দ্বারকানাথের চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি এবং কর্মজীবনের আলোচনা তাই আকস্মিক নয়।

নীলচাষ সম্পর্কে দ্বারকানাথ ও রামমোহনের বক্তব্য বহুল আলোচিত। নীলচাষের মতো সর্বজননিন্দিত এক প্রথার তাঁরা সমর্থক হলেন কি ভাবে? সে যুগেও এই প্রথার তীব্র সমালোচনা করে গেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকায়। রামমোহনের বক্তৃতায় এই কথাগুলি ছিল :

"নীলকুঠির আশেপাশের বাসিন্দারা নীলকুঠি থেকে দূরের জায়গার লোকদের চেয়ে ভালো কাপড় পরে ভালো অবস্থায় বাস করে।" নীলকুঠির খাস জমিতে বা সংলগ্ন জমিতে যারা চাষ করত, তারা মজুরি পেত এবং তাদের অবস্থা সাধারণ চাষীর তুলনায় হয়তো খারাপ ছিল না। কিন্তু নীলচাষ হত গ্রামে গ্রামে, জমিদারের এবং রায়তের জমিতে। এখানে দাদনপ্রথা ছিল ব্যাপক। দাদনপ্রথা গোমস্তা ও লাঠিয়ালের কল্যাণে চাষীকে প্রায় ভূমিদাসে পরিণত করে। ধানের জমিতে চাষী নীল করে, কিন্তু নীলের লাভজনক দর সে পায় না। নীলচাষীর ব্যাপক বিক্ষোভের পরিণতি নীলবিদ্রোহ, টাউন হলে দ্বারকানাথ-রামমোহনের বক্তৃতার ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে বিদ্রোহ ঘটেছিল। তাহলে দ্বারকানাথ ও রামমোহন এই প্রথাকে সমর্থন করতে পারলেন কি করে? এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক গবেষক লিখেছেন: "The Zamindars often enjoyed higher rents from the lands sown with indigo—a fact which might have brought Rammohun and Dwarkanath to the defence of the system." (Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency*, পৃঃ ২৩৫)। রামমোহন ও দ্বারকানাথ উভয়ই ছিলেন বিত্তবান জমিদার। দ্বারকানাথ স্বয়ং নীলকুঠির মালিক ছিলেন।

শ্রীঠাকুরের এই বই সুখপাঠ্য। ঘরোয়া ভাবে তিনি রামমোহনের যুগের আলোচনা করেছেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথের চিঠিপত্র বইতে উদ্ধৃত হয়েছে। সাহসের সঙ্গে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন, যার কয়েকটি মেনে নেওয়া গেল না, কিন্তু তাঁর বই পাঠকসমাজে সমাদর পাবার দাবি রাখে।

সুনীল সেন

প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দধারা প্রকাশন। ছ টাকা।

"দাওয়ায় নামকাওয়াস্তে ছায়া এক ফালি, সেই ছাওয়ায় বসে ওরা ঠোঙা বানাচ্ছে। সূর্য যত হেলবে ওরাও তত ঘনিষ্ঠ হবে। ...... ছায়া কাড়াকাড়ি করতে করতে এ ওর সাথে মিশে যেতে চাইবে। স্বার্থের টানে ভাই-বোনের ভালোবাসা তালগোল পাকিয়ে জমাট বাঁধবে। তারপর খিদেয় শ্রমে হতক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। ...... সকালে কয়েক খামচা করে মুড়ি

খেয়ে বিকেল চারটেয় ভাত খেতে হলে খাওয়ার আগে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেওয়া ভালো। ঘুম থেকে ওঠা মাত্র ভাত বেড়ে দিলে খেতে ইচ্ছে করে না। অনিচ্ছায় খেলে চালের খরচ কমে, হজমে দেরি হয়। ...... সংসারের জন্য মাধুরীকে কত প্ল্যানই খাটাতে হয়েছে! চোখ বুঁজে মাধুরী বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ বুঁজে থাকতে থাকতে, থাকতে থাকতে থাকতে থাকতে, আকাশে সূর্যের তাত সইতে সইতে, সূর্যের তাত সইতে সইতে সইতে সইতে মাধুরী ভাবতে চায় সূর্য নয়, চাঁদ। পৃথিবীতে রোদ নয়, জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার সাঁড়াসাঁড়ি বান ডেকেছে। জ্যোৎস্নায় বিশ্বচরাচর থইথই করছে। ...... পৃথিবীর সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে গেছে কিনা তাই ভোল বদলেছে জ্যোৎস্নাও।"

'প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি' মোট সাতটি গল্পের সংকলন। বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং প্রকাশিত এই গল্পগুলির গ্রন্থভুক্তি ঘটল উনিশশো তেষট্টির জানুয়ারি মাসে। সংকলনের প্রথম গল্পের (নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ) যে উদ্ধৃতি দিলাম উপরে, তা একটু দীর্ঘ হলেও গল্পগুলির সামগ্রিক মেজাজের উপস্থাপনায় প্রয়োজনীয় বোধ করেছি। .. আজ চৌষট্টি সালে যখন বিশেষ করে সাহিত্যের চেহারাটা একেবারে নড়বড়ে অজীর্ণ রোগীর ফাঁপা কেরামতিতে দাঁড়িয়েছে, তখন হঠাৎ-উপস্থিত এই গল্পগুলি অবশ্যই তর্কমূলক হওয়া সত্ত্বেও, সুস্থরকমের আকর্ষণীয়। আকর্ষণীয় নানা কারণে। যে-কোনো গল্পই তার প্রমাণ।

প্রথম গল্পে—'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ'-র মাধুরী ঘরগেরস্তালির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই জীবিকার যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার স্বামী বিপিন রায়, যে "ইংরেজ তাড়াবার জন্য প্রাণ দিতে" যাওয়ার পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে থেকে-থেকে সম্প্রতি বিপরীত পরিবেশের চাপে একেবার অনন্যোপায়-ভাবে ভিক্ষাজীবী, এবং দেহে-মনে অসুস্থ, অকর্মণ্য—তাদের আশ্চর্য আন্তর্বিরোধের কাহিনী অত্যন্ত সহজ নিরাসক্তিতে রচিত হয়েছে। এ নিরাসক্তি চাপা আন্তরিকতার। এ নিরাসক্তি আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে পাই। তাই হয়তো শান্তিবাবুর গল্পগুলি এতটা বেশি মানিকবাবুর কাছ-ঘেঁষা। দ্বিতীয় গল্প, 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'। এই গল্পটির চাল জটিল।

সামান্য ভাত-কাপড়ের সমস্যা মেটাতে কুন্তিকে এসে থাকতে হয় তার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় শ্যামলের বাড়িতে পরিচয় গোপন করে, এবং ফলত, শ্যামলের স্ত্রী চারুর অশান্তি। সমস্ত ব্যাপারটা একমাত্র শ্যামল ছাড়া আর সকলের অজানা থাকায় অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতমা চারুর উপর যে অনিবার্য ছায়াপাত ঘনিয়ে ওঠে, তারই নির্মোহ দলিল এই গল্পটি। এখানেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তৃতীয় ও পঞ্চম গল্পে ('মৃতজনে দেহ প্রাণ' এবং 'অন্ধজনে দেহ আলো') খুব একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করা না গেলেও, মোটামুটিভাবে লেখকের দায়িত্ববোধ এবং মমতা এ-দুটিতেও স্বচ্ছ। সংকলনটির ষষ্ঠ গল্পে ('কমলমুকুলদল খুলিল') নিচু জীবিকায় অভ্যস্ত কিছু মানুষের স্নেহ-ভালোবাসার খবর আমরা পাই বটে, কিন্তু তা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ায়, আসল স্বাদটুকু পেতে একটু অসুবিধা হয়। 'বন্ধু, রহো রহো সাথে' এবং 'আমি চঞ্চল হে' (চতুর্থ ও সপ্তম) যথাক্রমে দুটি সত্যিকারের উল্লেখ্য গল্প। আমাদের দেশের এই নষ্ট সমাজনীতির দ্বারা দুষ্ট ও প্রভাবিত এখনকার মানুষের আন্তর্সম্পর্ক প্রসঙ্গে এগুলি অন্তত আগামী কয়েক বছর পর্যন্ত স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে। যদিও গল্পগুলিতে মাত্র কয়েকটি বন্ধুর মধ্যেকার নানা জটপাকানো মনস্তাত্ত্বিক সংকীর্ণতার পরিচয়টুকু রেখেই লেখক সরে গেছেন আড়ালে, তথাপি, জাতকেরানী ভূপতি ও তার অসুস্থ বন্ধু রাজনৈতিক কর্মী জিতু—এবং একই আপিসের দুই সহকর্মী বন্ধু জগদীশ ও মুরারিদের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব—নিশ্চয়ই বলতে পারা যায়, এখনকার ছন্নছাড়া এই শূন্যমূল্য সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় যথাযথ।

মনে রাখতে হবে 'প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি' নামক গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল উনিশশো তেষট্টি, এবং ঘটনাস্থল কলকাতা। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে, অন্তত এই গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, অন্তর্ভুক্ত সাতটি গল্পেরই বিষয় হল বর্তমান কলকাতার সাধারণ, আচ্ছন্ন মানসিকতা এবং জীবনযাপনের জটিলতা। গল্পগুলি মর্বিড হতে পারত, কিন্তু হয় নি, প্রধানত লেখকের আটপৌরে বর্ণনামূলক টানা-বাক্যবিন্যাস ও স্বাভাবিক বিশ্লেষণভঙ্গির দরুণ। এবং এগুলি থেকে কখনো-কখনো এমনই এক কটুমধুর satire-এর স্বাদ উদ্ভূত হয়েছে (উদাহরণ, 'বন্ধু, রহো রহো

সাথে'-র ভূপতির বাড়ি-ফিরে-এসে জামাকাপড় খুলতে-থাকার অংশটি—৭২-৭৩ পৃঃ) যা বলা যায়, মানিকবাবুর পর অনেকদিন বাংলায় পড়ি নি। এরকম বলছি না যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম লক্ষ্য করেই শান্তিবাবু তাঁর কলমে কালি ভরেছেন, কারণ, কোনো কোনো অংশে 'প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি' তার নিজস্ব দায়িত্বে যথেষ্টরও অধিক আন্তরিক। সংকলনটিকে পৃথক ধরনের নতুন মনে হওয়াতে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছি, আর সেইজন্যই হয়তো, এই গল্পগ্রন্থটির স্থানবিশেষের অকারণ বাক্য-জটিলতা পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। তদুপরি, এ-জাতীয় গ্রন্থের বহিরঙ্গে ঐ ধরনের অহেতুক বিজ্ঞাপনটি প্রাথমিকভাবেই যে-কোনো পাঠকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাতে পারে, যেটা অন্তত এখানে এমন পরীক্ষামূলক সাহিত্যের মুখবন্ধে একেবারেই কাম্য ছিল না। জানি না, কি ভেবে শান্তিবাবু ঐ বিজ্ঞাপনী রসিকতার অনুমোদন করেছেন। ...এইসব সামান্য ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করেই বলছি, এই শ্রেণীর গল্পসংকলন এখনকার ভারতবর্ষে আরো প্রয়োজন। এ-রকমের শাণিত আবেগ বাংলাসাহিত্যে পুনর্বার আমদানি করার জন্য অবশ্যই শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপকের স্ত্রী ॥ অশোক রুদ্র ॥ ন্যাশনাল পাবলিশার্স ॥ ২·০০ ॥

ইতিহাসকে উপেক্ষা করে সাময়িকভাবে সফলতা লাভ করলেও পরে ইতিহাসের কাছে উপেক্ষিত হতে হয়। এই সত্য কোনো সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যতটা প্রযোজ্য তার থেকে কোনো শিল্পীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযোজ্য। Ibsen-এর *A Doll's House* নাটকটির ইংরাজী ভাষায় একাধিক রূপান্তর হয়েছে। William Archer এই নাটকটির প্রথম ইংরাজী রূপ দেন এবং শুধুমাত্র এই নাটকটির অনুগত রূপান্তর করার জন্যই Archer-এর নাম চিরকাল ইংরাজী সাহিত্যসেবীদের কাছে অমর হয়ে থাকবে। Archer-এর একজন সমকালীন নাট্যকার Henry Arthur Jones ও (Herman-এর সহযোগিতায়) 'Breaking a Butterfly' নাম দিয়ে *A Doll's House*-এর ইংরাজী রূপান্তর করেছিলেন। Jones তাঁর রূপান্তরে প্রায় সর্বত্র মূলের প্রতি আনুগত্য রেখে শুধু একটি জায়গায় নিজের বিচার-

বুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর Nora-Flora সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সন্তানদের চিন্তায় ঘরে আটকা পড়েছিল। আজ Jones-এর রূপান্তরটির কথা অসহায় গবেষক ছাড়া সকলেই বিস্মৃত হয়েছেন। *A Doll's Housa*কে কেন্দ্র করে ইংরাজী নাট্যজগতের এই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আধুনিক কালের বাংলা দেশে। Archer-এর মতো শ্রীশম্ভু মিত্র *A Doll's House*-এর একটি অনুগত রূপান্তর করেছেন 'পুতুল খেলা'য়। Ibsen-এর প্রতি আনুগত্য শ্রীমিত্রকে Archer-এর মতো সাফল্য এনে দিয়েছে। শ্রীঅশোক রুদ্র Jones-এর পথ অনুসরণ করে ঐ নাটকটির বাংলা রূপান্তর করেছেন নিজের মতে। ফলে শ্রীরুদ্র Jones-এর মতোই ইতিহাসের শিক্ষাকে অস্বীকার করে নিজেকে ইতিহাসের বিরাগ-ভাজন করেছেন।

A Doll's House-এর বিষয়বস্তু এককথায় নারীর নিজের প্রতি এবং পরিবার তথা সমাজের প্রতি দায়িত্বের দ্বন্দ্ব। Ibsen-এ এই সমস্যাটি একটি সুবিন্যস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত হয়েছে এবং পরিশেষে Nora-র ব্যক্তিত্ব অনমনীয় থেকেছে। শ্রীরুদ্রের কাছে Nora-র এই পরিণতিটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি, তিনি অন্য একটি পরিণতি কাম্য মনে করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতার মধ্যে না গিয়েও বলা যেতে পারে শ্রীরুদ্রের পক্ষে Ibsen-এর কাঠামোর মধ্যে থেকে অন্য পরিণতি ঘটানোর চেষ্টা আদৌ যৌক্তিক হয় নি। তিনি যদি একটি মৌলিক কাঠামোর মাধ্যমে নিজের বক্তব্য উপস্থিত করতেন, তাহলে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা না থাকলেও যুক্তিগত নিষ্ঠা এবং পারম্পর্য থাকত। কিন্তু 'অধ্যাপকের স্ত্রী'তে শ্রী রুদ্র মূলের কাঠামোটি প্রায় অবিকৃত রেখে নিজের সিদ্ধান্তটি চাপিয়ে দিয়েছেন। বিপদ ঘটেছে সেখানেই। Ibsen-এর Nora পুতুল থেকে ধীরে ধীরে যুক্তি-সহ ভাবে এক সুকঠিন ট্র্যাজিক ব্যক্তিত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে। শ্রীরুদ্রের নীরা শুরুতে 'স্বাধীনা জেনানা' থাকা সত্ত্বেও পরিণতিতে অত্যন্ত ছেঁদো কারণে হিঁদুয়ানীর খোলস পরছে কারণ শ্রীরুদ্রের ইচ্ছে তাই।

'অধ্যাপকের স্ত্রী' নাটকটি একটি 'Problem-play'। সমাজ ও নারীর ভেতরের সম্পর্ক নিয়ে শ্রীরুদ্র একটি thesis দিতে চেয়েছেন, কিন্তু একটি সার্থক 'Poblem-play' সৃষ্টি করতে গেলে নাট্যকারকে স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি প্রথমে শিল্পী, পরে প্রচারক। শ্রীরুদ্র সেই কথাটি ভুলেছেন। তিনি নাট্যকার হিসেবে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ যে কোনো নাটকের প্রাথমিক গুণ—Logical development of the theme—'অধ্যাপকের স্ত্রী'তে অনুপস্থিত। অথচ তাঁর thesis চাপিয়ে দিতে শ্রীরুদ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলত নাটকটিতে প্রচারকের স্থান নাট্যকারের উর্ধ্বে। এবং সেই কারণে এটি না হয়েছে একটি সার্থক নাটক, না হতে পেরেছে একটি গ্রহণযোগ্য thesis.

'অধ্যাপকের স্ত্রী'-র বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এটির অনাধুনিকত্ব। শ্রীরুদ্র যদি মনে করে থাকেন যে নীরার পরিণতি Nora-র মতো হলে বাংলা দেশের পাঠক বা দর্শক সেটি গ্রহণ করতে পারতেন না, তাহলে তাঁকে 'পুতুল খেলা'-র জনপ্রিয়তার কথা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এবং আর একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি যে পাঠক বা দর্শকের রুচির পরিবর্তন ঘটানো তো শিল্পীরই দায়িত্ব। Bjrnson যখন *Gauntlet* লিখে দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতার ধ্বজা ওড়াচ্ছিলেন, ঠিক তখনই Ibsen জনমতের ভয় না করে *A Doll's House* রচনা করলেন। Ibsen ভুল করেছিলেন না ঠিক করেছিলেন তার বিচার ইতিহাস করেছে। শ্রীরুদ্র যদি বিশ্বাস করেন যে নীরার পরিণতি Nora-র পরিণতির থেকে পৃথক করার এমনি কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে বাংলা দেশের জনমতকে উপেক্ষা করেও তাঁর সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব ছিল। সে দায়িত্ব শ্রীরুদ্র পালন করেন নি। নাকি শ্রীরুদ্র সেই দায়িত্ব সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না?

A Doll's House-এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কারিগরি করতে গেলে যতটা মনোযোগী হওয়া কাম্য, শ্রীরুদ্রের লেখায় তার ছাপ নেই। আশানুরূপ মনোযোগ থাকলে তিনি *A Doll's House*-কে একাধিকবার Doll's House লিখতেন না, 'পুতুল খেলা'কে 'পুতুলনাচ' বলতেন না, কমলের মা সুরমার মতো অপ্রয়োজনীয় চরিত্র আমদানী করতেন না (Jones-এর সঙ্গে আর একটি মিল!) চিন্তাশূন্য হয়ে নাটকের নামকরণ করতেন না। "আমার না—একবার—একবার—গর্ভ হয়েছিল।" বা "সে আমাকে—আমাকে—বেশ্যা ডেকেছে! বেশ্যা! আমাকে বেশ্যা ডেকেছে· ····!" জাতীয় আড়ষ্ট সংলাপ রচনা করতেন না। যাই হোক, পূর্বোক্ত দুর্বলতার তুলনায় এগুলি নিতান্তই তুচ্ছ।

পরিশেষে এই নাটকের পক্ষে একটি মাত্র কথা বলা যেতে পারে। H. A.

Jones তাঁর 'Breaking a Butterfly'-তে Ibsen-কে হত্যা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমিতেই Shaw, Galsworthy, Granville-Barker, Hankin, Baker প্রমুখ নাট্যকারদের সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। আশা করা যেতে পারে যে 'অধ্যাপকের স্ত্রী' তার চিন্তার জীর্ণতা এবং শৈল্পিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আগামী দিনের সার্থক এবং আধুনিক 'Problem-play'-র ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারবে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

অনিলের পুতুল ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ মানস প্রকাশনী ॥ ৫·৫০ পঃ ॥

অনিল নামীয় এক যুবক ও তার প্রেম-করে-বিয়ে-করা স্ত্রী পুতুলের সংসার-যাত্রার কাহিনী 'অনিলের পুতুল'। অনিল যে কোনো একজন মধ্যবিত্ত যুবক, যে কোনো এক সওদাগরি আফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। দাদা-বৌদি অসুস্থা মা ইত্যাদির যৌথ পরিবারের একজন, যার জীবন গণ্ডীবদ্ধ, আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্নের দিগন্ত সীমাবদ্ধ। অনিল অসন্তুষ্ট, শ্রদ্ধাহীন—কিন্তু অসন্তোষ এবং শ্রদ্ধাহীনতার কারণ জানে না। এই অনিলের জীবন আহার-নিদ্রা-সঙ্গমের এবং চমৎকারা অন্নচিন্তার পৌনপুনিকতার একঘেয়েমিতে ঠাসা। এই একঘেয়েমির সুতীব্র জ্বালাবোধ 'অনিলের পুতুল'কে সাধারণ উপন্যাসের স্তর থেকে উঁচুতে নিয়ে যায়। উপন্যাসের উপসংহার অবশ্য জীবনের স্বীকৃতিতেই, অর্থনীতির হিসাবকে অস্বীকার করে, অনিল শেষ পর্যন্ত যখন সংসারের নবাগতকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না করে স্বাগত জানাবে বলে ঠিক করে এবং ঠিক করে খুশি হয়ে উঠে।

অনিলের পুতুল অবশ্য প্রধানত অনিলেরই কাহিনী—পুতুল এখানে নিষ্প্রভ এবং কিছুটা ব্যক্তিত্বহীন। সেজো, নৃপেনদা, শৈলেশ ইত্যাদি চরিত্রগুলি অবশ্য দক্ষ হাতে চিত্রিত।

সঙ্গমের পৌনপুনিক বিবরণ অবশ্য কিছুটা বিরক্তিকর, সেজোর ঘায়ের বিস্তৃত বর্ণনায় গা-ঘিনঘিন করে এবং উপন্যাসের আবহাওয়াটা যদিও শ্বাসরোধকারী তবু একথা অনস্বীকার্য শ্যামলবাবু শক্তিমান লেখক এবং এই তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি দুর্লভ সিদ্ধি অর্জন করেছেন। নির্লিপ্তি শিল্পীর শ্লাঘনীয় গুণ, সে গুণ তাঁর আছে। কিন্তু শিল্পীর আরও একটা গুণ থাকা দরকার। 'তৃতীয় নেত্র' কথাটা ঘসা পয়সার মতো পুরনো শোনাতে পারে—তবু বলব, শিল্পী শুধু ঘটনার লিপিকার নন, ব্যাখ্যাতাও। যা ঘটে তাই শুধু তিনি লিপিবদ্ধ করেন না, যা ঘটতে পারত কিন্তু ঘটল না—তাও তার এক্তিয়ারভুক্ত। আশা করব, পরিণতিতে শ্যামলবাবু হয়ে উঠবেন জীবনের ব্যাখ্যাকারও, শুধু লিপিকার নন।

প্রদ্যোৎ গুহ

না ট্য - প্র স ঙ্গ

'নান্দীকার'-প্রযোজিত 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'

এই শতকের গোড়া থেকেই ইবসেনীয় ন্যাচারালিজমের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহের মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নাট্য-আন্দোলন নতুন নতুন চেহারা নিয়েছিল। সুইডেনে স্ট্রীণ্ডবার্গ 'প্যাশন'-এর নিবিড় চর্চায় বাস্তবের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে ন্যাচারালিজমের নতুন সংজ্ঞানির্দেশে ব্রতী হয়েছিলেন। জার্মানিতে কাইজার ও টলারের নেতৃত্বে এক্সপ্রেশনিজমের চর্চা শুরু হল—তার ঢেউ লাগল চেক্ নাট্যকার কাপকের, আমেরিকার এলমার রাইস আর থর্নটম্ ওয়াইল্ডারের নাট্যরচনায়। অন্যদিকে ব্রেখট্ তার 'এপিক রিয়ালিজম' নিয়ে উপস্থিত হলেন মঞ্চ-মায়াজাল থেকে মুক্ত করে নাটককে বুদ্ধিগত পরিমার্জনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ফ্রান্সে ককতো, স্পেনে লরকা, ইংলণ্ডে এলিয়ট, আয়র্লণ্ডে ইয়েট্স্ কাব্যের সঙ্গে নাটকের অভেদ রচনায় ব্রতী হলেন। ইতিমধ্যে ইটালিতে চিয়েরালি ন্যাচারালিজমের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুরু করলেন। চিয়েরালি-প্রদর্শিত পথে লিউইজি পিরান্দেল্লো সচেতনভাবে ইটালিতে ইন্টেলেক্চুয়াল্ ড্রামার সূত্রপাত করলেন।

অবশ্য পিরান্দেল্লো তার নাট্যজীবন শুরু করেছিলেন ইটালির ইবসেন-প্রেমিক গিয়োভানি ভার্গারই অনুসরণকারী হিসেবে—কিন্তু চিয়েরালির প্রভাবে অচিরে তার ইবসেনপ্রীতি ঘুচে গেল—এবং প্রবল আগ্রহে তিনি নিজস্ব নাট্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সযত্ন হলেন।

পিরান্দেল্লো নাটকে উপস্থিত grotesque and gruesome জগত স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটকের স্মারক। 'দি নেকেড' নাটকের নায়িকা নিতান্ত রোমান্টিক প্রতিপন্ন হবার লোভে ব্যর্থপ্রেমের অজুহাত রচনা করে আত্মহত্যা করবার ভান করেছিল—শেষ পর্যন্ত তার ভান ধরা পড়ে গেলে সে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করল। 'প্লেজার অফ্ অনেষ্টি' নাটকে এক মধ্যবয়সী সৎ ভদ্রলোক এক অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গে তার

যুবক প্রণয়ীর অবৈধ প্রেমকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হল। 'হেনরী দি ফোর্থ'
নাটকের উন্মাদ নায়ক সুস্থ হবার পরেও নিতান্ত সামাজিক দায়েই পাগলামির
ভান করতে বাধ্য হল। পিরান্দেল্লোর মধ্যে এই তিক্ততা স্ট্রীণ্ডবার্গের মতোই
কতটা পরিমাণে তার অসুখী ব্যক্তিগত জীবনের ফলশ্রুতি তার বিশদ
মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়—তবে ব্যক্তিগত জীবনে
পিরান্দেল্লো যে নিতান্তই বিপর্যস্ত ছিলেন এটা সত্য ঘটনা। উন্মাদ স্ত্রীকে
নিয়ে ঘরকন্না করা আর নিজের মেয়ের আত্মহত্যার সাক্ষী থাকার প্রভাবে
শিল্পরচনায় cynicism-এর আবির্ভাব স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু তার
চেয়েও বড় কথা হল এই যে এ-যুগের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতো তাঁর রচনাতেও
পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয়ের প্রকট চেহারা লভ্য।

কিন্তু বীভৎসের উদ্ঘাটন ছাড়াও পিরান্দেল্লোর নাটকের আরেকটি
উল্লেখযোগ্য দিক আছে—সেটি হল Reality-র সঙ্গে নাট্যশিল্পের সম্পর্ক
বিষয়ে, মানবচরিত্র সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তার তত্ত্বগত উপস্থিতি। প্রথমত
'প্যাশন'কে তিনি মঞ্চে আনেন বুদ্ধিগতভাবে দর্শকের কাছে তাকে উপস্থিত
করবার জন্য—সে সম্পর্কে কোনো মায়ামোহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। এ-সম্পর্কে
তার নিজের বক্তব্য স্মরণীয় : "People say that my drama is
obscure and they call it cerebral drama. The new drama
possesses a distinct character from the old : whereas the latter
had as its basis passion, the former is the expression of the
intellect." পিরানদেল্লোর এই 'ইন্‌টেলেকচুয়ালিজম্'কে এরিক্ বেণ্ট্লে
একটু ঠাট্টাই করেছেন তার *Playwright as Thinker* বইতে। কিন্তু
একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে পিরান্দেল্লোর রচনায় নাটক ও
তার নিজস্ব নাট্যতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বিশেষ করে তার *Six*
Character in Search of an Author-এ। শুধুমাত্র মঞ্চমায়াকে ভাঙবার
জন্যই নয়, ইবসেনীয় নাট্যপদ্ধতির সঙ্গে তার একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে
চরিত্রচেতনায়। এ-প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্যসমালোচক এলার্ডাইস্ নিকলের বক্তব্য
উল্লেখ করা যেতে পারে : "For Ibsen, a character might be complex
but the character was always one despite the complexity :
Pirandello splits the atom that is mam, and with explosive
results." সত্তার যে বিভিন্ন রূপ আছে এবং সেগুলি যে পরস্পরবিরোধীও

হতে পারে একথা দর্শকদের এবং 'অভিনেতা'দের মনে করিয়ে দেবার জন্য
তাই 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'র 'বাবা'র এত প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এবং
সেই সঙ্গে এ-কথাও বার বার মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা যে অভিনেতারা
যতই কলাকুশলী হোন না কেন—সত্তার বিভিন্ন রূপগুলির 'real' চেহারা
তৈরি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব—অতএব তাদের উচিত মঞ্চে চরিত্রকে নকল
করা নয়—তাকে বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করা। এই হল তার
নাট্যশিল্পের তাত্ত্বিক ভিত্তি। অবশ্যই এ-কথা মনে হতে পারে যে 'split
personality' সম্পর্কে পিরান্দেল্লোর এই মতবাদ এমন কিছু নিজস্বতার
পরিচায়ক নয় এবং শেষ পর্যন্ত তার তত্ত্বে গঠনমূলকতার চেয়ে প্রচলিত
নাট্যপ্রথার প্রতি আক্রমণশীলতাই বেশি মূল্যবান। আর এমনি একজন
নাট্যকারের এমন একটি নাটককে (*Six Character in Search of an*
Author) বাংলাতে রূপান্তরিত করে কেউ যদি অভিনয় করেন তবে কিছু
প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। প্রথম কথা পিরান্দেল্লো যে 'Reality'কে
এ নাটকে, বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবেই হোক, মঞ্চস্থ করছেন—ভারতীয় বাস্তবে তার
প্রতিরূপ আছে কিনা (না থাকলে শুধু অনুবাদ করে অভিনয় করা উচিত—
পটভূমিকা অপরিবর্তিত রেখে)—দ্বিতীয় কথা পিরান্দেল্লোর নিজস্ব নাট্যনীতি
এখন বাংলা নাটকে প্রয়োগ করার সার্থকতা আছে কিনা। নান্দীকারের
অভিনয় দেখবার সময়েই প্রথম প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়—
কেননা, বুর্জোয়া নীতিবোধের অসারতা, সামাজিক ব্যাভিচার, স্বামী-স্ত্রী-পুত্র
সম্পর্কের জটিলতা আমাদের আধুনিক জীবনকে পীড়ন করে—সেজন্য ঐ সব
সমস্যাকে আমাদের সমস্যা মনে করাতে কোনো বাধা নেই যেমন কোনো বাধা
নেই ইবসেনের জগতকে আপন করে নিতে। গ্যাসমারের কথায় বলতে গেলে
পিরান্দেল্লোর "anti-bourgeois protest against a smug society"
আমাদের সমর্থন পেতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি একটু জটিল। প্রথমেই মনে হতে
পারে ন্যাচারালিজমের সুস্থ আদর্শ গড়ে ওঠবার আগেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
ফ্যাশনে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হল তত্ত্বের
একটা বিশাল অংশ Conventional মঞ্চব্যবসার প্রতি ব্যঙ্গাশ্রয়ী—সেগুলি
আমাদের দেশেও নিতান্তই সুপ্রযুক্ত এবং উপভোগ্য।

এর জন্য রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ভাবানুবাদ এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পরিচালনা প্রশংসনীয়। তবে অভিনয়ের ত্রুটিতে তাত্ত্বিক দিকটা সব সময়

সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু নাটকের মধ্যে 'অভিনেতৃবৃন্দে'র চরিত্রে নান্দীকারের অভিনেতৃবর্গ দলগত অভিনয়ে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছেন—অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের উপভোগ্য অভিনয়ের সঙ্গে মিলে তাতে পেশাদারী নাট্যাভিনয়ের ব্যবসাবৃত্তির প্রতি ব্যঙ্গটা ফুটেছে ভালো।

পিরানদেল্লোর এ নাটককে পশ্চিমে 'কমেডি' আখ্যা দেওয়া হয়—সে সম্পর্কে গ্যাসমার বলছেন : "His laughter is saturrine, if not indeed indistinguishable from acute distress." নান্দীকার গোষ্ঠী রূপান্তর করবার সময় এ-নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসাধন করেছেন। পিরানদেল্লোর *Cerebral* নাটককে বাংলাতে যথেষ্ট পরিমাণে "emotional experience"-এর বাহন করে তোলা হয়েছে। মূল নাটকের "saturrine laughter"-কে বজায় রেখেও নান্দীকার "acute distress"-কেই প্রধান করে তুলেছেন। শেষ দৃশ্যে নিঃসঙ্গ তিনটি চরিত্রের অনন্ত পরিক্রমার নিশ্চল ছবি (মূল নাটকে নেই—মূল নাটক ম্যানেজারের একটি হাল্কা কটূক্তি দিয়ে শেষ) দেখিয়ে নাটকের "তীব্র বেদনা"-কে প্রকট করা হয়েছে। এর ফলে নাটকের কমেডি চরিত্র যে ঘুচে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন চেহারা যা দাঁড়িয়েছে সেটা প্রশংসনীয়।

ব্যক্তিগত অভিনয়ে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। Stylisation সর্বত্রই সার্থক হয় নি—কারো কারো উচ্চারণে দোষ আছে। কিন্তু সমগ্রভাবে প্রযোজনা সার্থক এবং এমন একটি দুরূহ নাটক নিয়ে এমন আন্তরিকতাপূর্ণ চর্চা অভিনন্দনীয়।

ধ্রুব গুপ্ত

বি জ্ঞা ন - প্র স ঙ্গ

হ'য়েল, নারলিকার এবং অতঃপর ?

আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি, জটিল গণিত ও তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার চড়াই ও উৎরাই অতিক্রম না করে এই দুর্বোধ্য বিষয়কে জানা সম্ভব নয়। তবুও আলোচনা করতে হবে। কারণ, ভাবতে হবে কেন এই আলোড়ন।

দার্শনিক ফয়েরবাখের তত্ত্ব পড়ে যে সমাজবিজ্ঞানী উত্তেজিত হয়ে এগারোটা থিসিস্ লিখে ফেলেছিলেন, তাঁর উত্তেজনার কারণ ছিল। কেননা, কর্মকাণ্ডে উত্তেজনারও স্থান আছে। পদার্থবিদ্যা মূলত জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এখানে, এই উত্তেজনা অসুস্থতার Euphemism মাত্র। এই প্রবন্ধ এই উত্তেজনা প্রশমনে প্রয়াস পাবে।

প্রশ্ন উঠেছে, মহামতি আইনস্টাইন-এর General Theory of Relativity নিয়ে। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে, নতুন করে আইনস্টাইন-অধ্যায় লিখতে হবে বিজ্ঞানের সারণীতে। ডঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার ভারতীয়। অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল তাঁর গুরু তথা সহকর্মী। নারলিকারের গবেষণায় আমরা ভারতীয়রা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে পারি। কিন্তু আজ যদি এতদিনের সঞ্চিত মনীষা এক নিমেষে সন্দেহের কারণ হয়ে উঠে, আমাদের কি সেই সন্দেহকেও একটিবারের জন্য সন্দেহ করা নিতান্ত সেকেলে কু-অভ্যাস বলে প্রতিভাত হবে ? বিশেষ করে, এই নতুন তত্ত্বের স্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা নিজেরাই যখন এর প্রমিতি সম্বন্ধে কোনো নজির দেখাতে পারেন নি। একটি তত্ত্বের সমর্থনে অনেক নমুনা থাকে। কিন্তু একটি মাত্র Crucial Test হয়তো তাকে বানচাল করে দিতে পারে। এইটুকু Test of Time প্রয়োগ করাই বিজ্ঞানের রেওয়াজ। তাই প্রশ্ন উঠে—এই আলোড়ন প্রাকৃতজনসুলভ চিত্ত-দৌর্বল্য কিনা।

যে অট্টালিকায় আমরা অনেক মানুষ বাস করছি, একদিন সকালে যদি জানতে পারি তার ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে, আমরা কি আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ফেটে

পড়ি। নতুন ইমারত, নয়া ইনসান গড়তে হবে,—ধ্বনি হিসেবে সুন্দর হলেও জটিল শ্রমের কারণ (এবং দুশ্চিন্তারও) প্রকৃত স্থপতিদের। তাই হয়তো বিজ্ঞানীমহল আজ নিথর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে,—মোদ্দা কথাটা কি ? নিউটনের আমলে 'Action-at-a-distance'-এর তত্ত্ব চালু ছিল। যেমন ছেলের অসুখ মা দূর থেকে ঠাহর করতে পারেন। এই প্রাণিক স্পন্দনের মতো নাকি বস্তুজগতের শক্তিও লাফিয়ে চলে এক বস্তু থেকে অন্যত্র। মহাকর্ষকে এই ভাবে জড়বস্তুর ভর ভিত্তিক তথা দূরশ্রুত মহাশক্তি-ভিত্তিক আকারে নিউটন একদা খাড়া করেন। তার পরিণতি আমরা জানি। জানি, আলোর গতিবেগ সসীম। এও জানি তা লোরেনৎস 'invariance' মেনে চলে। যা সাধারণ যুক্তির আপেক্ষিক বেগের মধ্যে এক গৌরবময় ব্যতিক্রম। কিন্তু এইসব তত্ত্ব জানা ও একই সঙ্গে Radiation-কে তরঙ্গের কারণ হিসেবে জানা প্রকৃতই 'Action-at-a distance'-কে অস্বীকার করার পরের অধ্যায়। আবার 'Action at a distance' দেখা দিলে 'Maxwell-Dirac field' ভেঙে যাবে, এটাও বিবেচ্য। কিন্তু বস্তু কি ? বস্তুর গুণেই মহাকর্ষ ? না দেশের হ্যাজতার তারতম্য, যা জড়সান্নিধ্যঘটিত, তার জন্য ?

দ্বিতীয় উত্তর বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের। প্রথম উত্তর প্রাচীনদের। তা ছাড়া, বস্তু কি মহাবিশ্বে নিরবচ্ছিন্ন ? না অবচ্ছিন্ন ? এখানেও দ্বিতীয় উত্তর আইনস্টাইনের, প্রথমটি দার্শনিক ম্যাক্ (Mach)-এর (যে ম্যাক্-এর বিরুদ্ধে *Empirio-Criticism* ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক প্রচুর সমালোচনা করেছেন অন্য তত্ত্বগত প্রসঙ্গে)। অঙ্কশাস্ত্রে Singularity বলে একটা কথা আছে। Analytical function যে বিশেষ কয়েকটা বিন্দুতে বা স্থানে non-analytical হয় তাকেই Singularity বলে। আধুনিক Field Theory-এর সঙ্গে charge ও আপেক্ষিকতা Mass বা matter-কে জড়িত করে থাকে। তাই, অবচ্ছিন্নতা হয়েল ও নারলিকারের Field-এ বিশ্বাস করে না। কারণ Self-field of election, Vacuum polarisation ইত্যাদিতে aesthetic value কমে যায়। কিন্তু একটা কথা, নতুন কোনো High Energy Physics তৈরি না করে, পুরনো অসুবিধের বদলে অসুবিধে-দুষ্ট সমস্ত পুরাতনকে বরবাদ করা তো এক হিসেবে শূন্যে প্রস্থান।

আরো একটা প্রশ্ন উঠেছে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব নাকি Physics is a handmaid of abstract geometry. তাঁদের দুজনের নতুন তত্ত্ব নাকি মহাবিশ্বের ধর্ম থেকে উৎপন্ন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চাইছেন তাঁদের method-টা inductive। কিন্তু গোটা বিশ্বের উপরে inductive method প্রয়োগ আদৌই সম্ভব কিনা,—পাল্টা তর্ক দার্শনিক মিল (Mill) বেঁচে থাকলে হয়তো তুলতেন। দুনিয়াতে true induction নেই। মানবমনের deduction-এর কাছে আমরা পুরুষানুক্রমে থামকা মাথা নিচু করি নি। নিরুপায় হয়েই করেছি। দেখা যাক্, সত্যিই আইনস্টাইনের তত্ত্ব abstract কিনা। সত্যিই তাতে পদার্থবিদ্যা অনাদৃত কিনা।

বিজ্ঞানের ছাত্রদের জানা আছে, মহাকর্ষ-তত্ত্বে 'Metrical Continuum' প্রকল্পের স্থান কত গভীরে। কিন্তু এই আইনস্টাইন-রীমান দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো বিন্দুর Metrical Structure শেষ বিচারে Group of Rotations-এর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ গোটা Rotationগুলো মিলেই একটা Group তৈরি করা চাই। পিথাগোরাস তত্ত্বে Metric space-এর বৈশিষ্ট্য ছিল : এই Group of Rotations আসলে linear transformations থেকে উৎপন্ন. এর গুণ হল Quadratic Ground formকে নিজের Identity-তে পৌঁছে দেওয়া। Rotation যদি পদার্থবিদ্যা না হয়, Angular Momentumও নয় ; তাহলে Dispersion Relations রসাতলে যায়। বরং এই বিশ্বে Atom বা universe সবই Rotation-ধর্মী গতিবিদ্যা আশ্রয় করে আছে। নিউটন-এর সেই Pythagorean Metrical space সম্বন্ধেই অবাস্তবতার অভিযোগ আনা যায়।

নারলিকার-তত্ত্বে Field নেই শুনেছি। তাহলে Creation fieldটা কি ? যেটা নাকি Matter-এর সৃষ্টি-ধ্বংসের নিয়ন্তা ! এই Creation field-এর প্রয়োগে আইনস্টাইনের General field equationer থেকে নাকি Continuous universe জাতীয় আশ্চর্য রকমের সংকেত মেলে, ঠিক যেমন এতদিন শুধু field Equations থেকে অন্য অনেক সত্যের আভাস পাওয়া গেছে। আইনস্টাইন-তত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ এবং আইনস্টাইন-নারলিকার সমবায় ত্রুটিহীন—এ দুটো কথা মেনে নিলে যে তৃতীয় অশুভ একটা বিষয়ও মেনে নিতে হয়, তা হল হ'য়েল-নারলিকারও নির্ঘাত ভুল।

দার্শনিক ম্যাক্ (Mach)-এর বিশ্বাস ছিল 'Continuous Creation of matter'-এ। হ'য়েল ও নারলিকারের বিশ্বাসও অনুরূপ। Theory of

special creation যতদূর জানি বাইবেলের ব্যাপার। খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পূর্বে বেলা ন'টা নাগাদ (আর কিছু করার না পেয়ে ?) ঈশ্বর একদিন বিশ্ব সৃষ্টি করে বসলেন। একথা মেনে নিতে কিন্তু আইনস্টাইন বাধ্য করেন না। সর্বোপরি তিনি মূলত Agnostic ছিলেন। দার্শনিক ম্যাক্ (Mach)-এর বিশ্বাসকে যুক্তি-তর্কের পিচ্ছিল পথে নারলিকার-হ'য়েল দেখিয়েছেন, বিশ্বের অন্য কোনো ভর না থাকলে, আমাদের ভরও শূন্য হয়ে যাবে। Absolute motion অর্থহীন। 'Aslolute Acceleration' অর্থহীন। তারপর কি ভরও অর্থহীন ?

প্রথম দুটো কথা আইনস্টাইন তাঁর Special ও General Theory of Relativity-তে প্রমাণ করেছেন। আর তৃতীয়টা হ'য়েল-নারলিকার তাঁদের তত্ত্বে দেখালেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এতেই কি বিজ্ঞানের 'নবযুগ' এসে যাবে ? Space-কে একরত্তি density তো আপেক্ষিক-তত্ত্ব আগেই দিয়ে রেখেছে। তাহলে Creation Field-এর প্রেরণা কোথায় ?

যে কোনো ভরকে বাকী বিশ্বের ভরের সঙ্গে তাঁরা সমীকরণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এতটা গতিও আমাদের জানা নেই। মন্তব্যও অবান্তর। তবে, Quantum Field-এ এসব ব্যাপার ঘটে থাকে অর্থাৎ এই ধরনের partition scheme। মহাকর্ষের দুর্বলতাকে (বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের তুলনায়) বিশ্বের মোট প্রোটন-সংখ্যার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টাও হ'য়েল-নারলিকার করেছেন।

তাঁদের সাফল্য (ও বিজ্ঞানেরও) কামনা করি।

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

শতবার্ষিকীর সংকল্প

খ্রীঃ ১৮৬০-এর সময় থেকে বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টির জোয়ার দেখা দেয়, সাহিত্যের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়। আরও বিস্ময়কর তার পরবর্তী কয়েকটি বৎসরে বাঙালী মহামনস্বীদের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ থেকে সেই জ্যোতির্মণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বুঝে উঠতে পারি না—এ কি নিগূঢ় রহস্য, না, ইতিহাসেরই নিয়ম ? সঙ্গে সঙ্গে শত বৎসর পরে আজ প্রশ্ন জাগে—বিংশ শতকে কি এমন একটা দশক বা এমন একটা যুগ বাঙলা দেশে বা ভারতবর্ষে আর এসেছিল বা আসবে ? এ বৎসরই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির জন্মের শত বৎসর পূর্তি—আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ কিন্তু বিগত শত বৎসরের দিকে তাকিয়ে ভাববার মতো সাহস পাই না যে, এমন নক্ষত্রমণ্ডলী এ শতাব্দীতেও আর ফিরে পাব। এসব মনস্বীদের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবও যথাযথরূপে পালন করি কিনা তাতেও আমাদের সন্দেহ জাগে। জওহরলালের অন্ত্যেষ্টি-সমারোহেও এই প্রশ্নই মনে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে আমাদের খোঁচা দিয়েছে। অনুষ্ঠান ও সমারোহের যতটা সুযোগ স্বাধীনতা-লাভের ফলে আমরা আয়ত্ত করেছি, ভাববিলাস-বর্জিত অন্তরের গভীরতা ও সংকল্পের সুস্থিরতা সে পরিমাণে আমরা সঞ্চয় করতে পেরেছি কিনা কে জানে ?

স্মৃতিউৎসবগুলি আমাদের আত্মস্থ হবারও আহ্বান। নানা কারণেই আজ আমাদের পক্ষে তা প্রয়োজন। বাঙলা দেশের কেন, ভারতবর্ষের শিক্ষা-জগতে আজ এমন সংকট দর্শায়িত যে, এ সময়ে কে শতবার না মনে করে পারে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম ? একদিন অতি-সীমিত পরিবেশে তিনি যে দুর্বার সাহস ও নির্মাণশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন আজ তার অবসর অনেক বিস্তৃত, কিন্তু কোথায় সেই সৃষ্টিধর প্রতিভা ? গত ২৮শে জুন যখন তাঁর শতবার্ষিক-উৎসব পালিত হয় আমরা তখন বিশেষ ভাবেই এই প্রশ্নের দংশন-জ্বালাও অনুভব করেছি। তাঁর কীর্তি শত দিকে, শত ভাবেই তা কীর্তনীয়। সেই সঙ্গেই স্মরণীয় আজকের ব্যাপকতর পরিবেশে জটিলতর শিক্ষা-সংকটের কথা, তার সমস্যা ও সমাধানের উপায়। নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের (মিঃ চাগ্‌লার) প্রস্তাবিত শিক্ষা-কমিশন সেদিকে একটি আবশ্যকীয় চেষ্টা। কিন্তু আশুতোষের এই শতবার্ষিকটি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্রতীরা বিশেষভাবে এই

জাতীয় শিক্ষা-সমস্যার আলোচনার বৎসরে পরিণত করুন না? 'পরিচয়'-এর পক্ষ থেকে আমরা আমাদের পরিমিতক্ষেত্রে বাঙালী শিক্ষাবিদ্‌দের এ জন্যে সবিনয়ে আহ্বান করি—আশুতোষের দানের কথা ও শিক্ষার বর্তমান সংকটের কথা আলোচনা সকৃতজ্ঞচিত্তে পত্রস্থ করা আমাদের কামনা।

ঠিক সেইরূপই আমাদের আশা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মনীষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, ভাষা-সমস্যার আলোচনা, তাঁর জন্মশতবার্ষিক বৎসরে 'পরিচয়'-এর মারফৎ তা পরিবেশণ করা। আমাদের শক্তি অত্যন্ত সামান্য, আর আয়োজনও ত্রুটিপূর্ণ। এই পুণ্যক্ষণগুলিতে আমরা আমাদের সেই দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন বলেই চাই আমাদের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা জাগুক—আত্মপরীক্ষা জাগুক, জাগুক এইরূপে জাতীয় সমস্যাসমূহকে প্রত্যক্ষ করবার মতো সংকল্প ও সাহস!

নতুন পত্রিকা

ইচ্ছা থাকলেও আমরা যা করে উঠতে পারি না তার মধ্যে একটি 'পত্রিকা পরিচয়।' সংস্কৃতি-সংবাদ আজ অনেক সাময়িক পত্রেরই একটি সাধারণ প্রচেষ্টা, 'পরিচয়'-এর আর একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। অবশ্য তা বলে 'পরিচয়'-এর অক্ষমতা ক্ষমার্হ, তা বলি না। বিশেষত, অন্যত্র অনেক ক্ষেত্রেই যখন সংস্কৃতি-বিলাস ও ব্যক্তি-বিজ্ঞাপনেই সংস্কৃতি-চর্চা উদ্দিষ্ট। তথাপি 'পত্রিকা পরিচয়' বিষয়ে আমাদের ত্রুটি আরও বেশি জমছে, তা স্বীকার করি। একটা কারণ, দেশীয় ও বিদেশীয় বহু সাময়িক পত্রেই আজ অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রকাশিত হয়—পরিমাণে অনেক বেশি যা অর্থহীন এবং অনেক বেশি সার্থকও। সে সবের খতিয়ান-রাখার আশা তাই ছেড়ে দিতে হয়। আবার, দেশে ও বিদেশে ওরূপই উল্লেখযোগ্য নতুন পত্র ও বই প্রকাশিত হয়। যাদের আবির্ভাব অভিনন্দনযোগ্য তাদেরও আমরা অভিনন্দন জানিয়ে উঠতে পারি না। যেমন সাপ্তাহিক 'কালান্তর'-এরও আমরা উল্লেখ করি নি। দুটি সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙলা পত্রের তথাপি উল্লেখ না করলেই নয়। শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত সুদীর্ঘ কারাবাসের পরে বাঙলা সাময়িক পত্রের জগতে আবির্ভূত হয়েছেন 'কম্পাস' নিয়ে। 'কম্পাস' সংবাদ-সাপ্তাহিক; গতানুগতিক বাঙলা পত্রিকা নয়। ইতিমধ্যেই তা বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—শকুন্তল সেন-এর পাকিস্তানের রিপোর্ট তো একটা অভিনব

কীর্তিই বলতে হবে। কিন্তু কম্পাস-এর কোনো সংখ্যাই না পড়বার মতো নয়। অনেক প্রস্তাবই তথ্যে ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। আরেকটি নতুন চেষ্টা—শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী-সম্পাদিত নতুন মাসিকপত্র 'নবজাতক'। মৈত্রেয়ী দেবী বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক মৈত্রের জন্য আপনাকে আত্মনিয়োগ করেছেন। মূলত যে তিনি কবি ও সাহিত্যিক সে সত্য তিনি ভোলেন নি, 'নবজাতক'ও তাঁকে ভুলতে দেয় নি। তাই 'নবজাতক'কেও অভিনন্দন জানাই।

একমাত্র প্রবন্ধ বা একমাত্র কবিতার বাহন হিসাবেও যে বাঙলা পত্র একমাত্র গল্পের বাহনদের পার্শ্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটিও কম উল্লেখযোগ্য কথা নয়। তাঁদের কথাও ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল। কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লিভিং এজ-এর (আমেরিকা) মতো কি বাঙলায় একটি সংকলন-পত্র প্রকাশ অসম্ভব?

গোপাল হালদার

প্রাপ্তি-স্বীকার : সুশলভ রিপোর্ট

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম অধিবেশনে এম. এ. সুশলভ 'বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবিধানের সংগ্রাম' শীর্ষক যে রিপোর্ট পেশ করেন তার ইংরেজি এবং বাংলা তরজমা আমরা সমালোচনার জন্য পেয়েছি 'তাস' সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে।

সোভিয়েত-চীন মতবিরোধ আজ সংবাদপত্রের নিত্যকার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিরোধ কি নিয়ে, কারা এই বিরোধের জন্য দায়ী এবং বিরোধ এড়াবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কি করেছে এবং করছে—এই সুদীর্ঘ রিপোর্টে সুশলভ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। তিনি কটু-কাটব্য বা গালিগালাজের আশ্রয় নেন নি—যা ইদানীংকার চীনা দলিলগুলির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—তথ্যের পর তথ্য, যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে তিনি তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সুশলভ রিপোর্টের সঙ্গে হয়তো অনেকে একমত নাও হতে পারেন কিন্তু তারাও অবশ্যই একথা না মেনে পারবেন না যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিরোধ কি নিয়ে তা জানবার পক্ষে সুশলভ-রিপোর্ট একটি অবশ্য-পাঠ্য দলিল।

শচীন বসু

'পরিচয়' শেক্সপীয়র সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৭১) শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত লিখিত 'বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই তিনটি বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে :

"১৯৬৩ সালে আমেরিকা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে আমাদের দেশে শেক্সপীয়র-চর্চার পরিপূর্ণ বিবরণী পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের শেক্সপীয়র-চর্চার তথ্যকে একত্রিত করে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ডক্টর অমলেন্দু বসু সেদিন কোনো তথ্যই পাঠাতে পারেননি।"

শেষ বাক্যটি কিয়ৎপরিমাণে অস্পষ্ট এবং সেজন্য আমার 'অপারগতা' সম্বন্ধে পাঠকগণ হয়তো প্রতিকূল ধারণা পোষণ করতে পারেন, অতএব ঘটনা যা হয়েছিল সে বিষয়ে আমি সংক্ষেপে দু'কথা লিখছি।

১৯৬৩ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে একটি ইণ্টারন্যাশনাল সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক কংগ্রেস উপলক্ষে পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্রায় পাঁচশো ডেলিগেট নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছিলেন। এই ডেলিগেটদের মধ্যে আমিও ছিলাম। একদিন কিছু ডেলিগেটদের এক বেসরকারী সম্মিলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে একটি ইণ্টারন্যাশনাল বিব্লিওগ্রাফি প্রস্তুত হওয়া কাম্য। এ-প্রসঙ্গে আমাকে অনুরোধ করা হল যে আমি ডিসেম্বর ১৯৬৩-র মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান' বিব্লিওগ্রাফি প্রস্তুত করতে পারব কি না।

উত্তরে আমি বলেছিলাম যে সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে 'ইণ্ডিয়ান' কথাটিতে একটি অখণ্ড ভাষা ও সাহিত্য বোঝায় না। যে অর্থে জাপানী ভাষা ও সাহিত্য অথবা পোলিশ ভাষা ও সাহিত্য বলতে মাত্র একটি ভাষা ও সাহিত্যই বোঝায়, 'ইণ্ডিয়ান' বলতে তেমনটি বোঝায় না, কারণ ভারতবর্ষে অন্তত ১৪টি মুখ্য ভাষা ও সাহিত্য চলমান। এ ছাড়া আরও অনেক ভাষা ও সাহিত্য বিদ্যমান। কেবল মুখ্য ভাষাগুলির কথাই যদি বলি তাহলে সেগুলি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলির সঙ্গে তুলনীয়, কী ব্যাপকতায় কী সাহিত্য-সমৃদ্ধিতে। হিন্দীভাষীর সংখ্যা পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষাভাষীদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করেছে। আমার নিজ ভাষা বাংলায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য

রীতিমত সমৃদ্ধ, বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী বাদ দিয়েও যে বাংলা সাহিত্য অবশিষ্ট থাকে তা বৈচিত্র্যে ও মহত্ত্বে যে কোনও অপর সাহিত্যের তুলনায় মর্যাদা পেতে পারে। আমি আমার নিজ ভাষায় (বাংলায়) শেক্সপীয়র গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। বস্তুত বাংলা ভাষায় এই বিশেষ বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী-সংক্রান্ত কাজ ইতিপূর্বেই কিছু হয়েছে। হিন্দী ভাষার পঞ্জী সম্বন্ধেও আমি দায়িত্ব নেবার স্বীকৃতি দিয়েছিলাম। আমার জনৈক উত্তর-ভারতীয় ছাত্র আমার উপদেশে হিন্দী-সাহিত্যে শেক্সপীয়রের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং এতদুপলক্ষে চমৎকার পঞ্জী প্রস্তুত করেছেন। আরেক ছাত্র উর্দুতে ও আরেক ছাত্র তেলেগুতে (এই দুই ভাষার একটিও আমি জানি না) আমার শেখানো পদ্ধতিতে শেক্সপীয়র-পঞ্জী প্রস্তুত করছেন। এঁদের সাহায্যে আমি মোট চারিটি ভাষা ও সাহিত্যের পঞ্জী সরবরাহ করতে সমর্থ কিন্তু চৌদ্দটি ভাষা ও সাহিত্যের পঞ্জী প্রণয়ণ আমার সাধ্যের অতীত, সম্ভবত যে কোনও ব্যক্তির একার সাধ্যাতীত। এই কথা আমি নিউ ইয়র্কের সেই সম্মিলনে বলেছিলাম।

এই হল আমার 'অপারগতার' কাহিনী। শ্রীমান রুদ্রপ্রসাদের বাক্যের অস্পষ্টতায় এমন ধারণা হতে পারে যে আমার অপারগতা আসলে আমারই দুর্বলতা, যদিও সেটা সত্য কথা নয় এবং তেমন ধারণা সৃষ্টি করা তাঁর অভিপ্রেতও নয়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে বর্তমান ১৯৬৪ সালে বাংলায় উপরোক্ত গ্রন্থ-পঞ্জীর অনেক মূল্যবান ছিটেফোঁটা এখানে সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটি নানা ভাষার গ্রন্থপঞ্জী। কিন্তু সর্বভারতীয় সম্পূর্ণ পঞ্জী এখনো প্রস্তুত হয়নি, কয়েক বছরের মধ্যে হবার সম্ভাবনা দেখছি না। সাহিত্য আকাদামি এ বিষয়ে নিরাসক্ত। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ইংলিশ স্টাডিজ-এর সম্পাদনা-সমিতির সভাপতি হিসাবে আমি একটি সর্বভারতীয় শেক্সপীয়র-গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ণের চেষ্টা করছি।

অমলেন্দু বসু

হুগো প্রসঙ্গ

চৈত্র মাসের 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত শ্রীকুমার সেনের পত্রটি পড়লাম। আমার লেখায় একটি অবান্তর লাইনই তাঁর উষ্মার কারণ হয়েছে। "হুগো ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক" এই লাইনটি দিয়ে হুগোর রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্রমবিকাশ

নিয়ে কিছু আলোচনা করব ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে সে ইচ্ছা ত্যাগ করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় লাইনটি কাটতে ভুলে যাই। তবে পত্রলেখক উত্তেজিত হয়ে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। এগুলির জবাব দেওয়া দরকার।

প্রথমত, হুগোর কোনো মূল্যায়নের এবং সেই প্রসঙ্গে লাফার্গের সমালোচনা করার কোনো চেষ্টা আমি করি নি এবং করা সঙ্গতও মনে করি নি।

দ্বিতীয়ত, লাফার্গের সূত্র অনুযায়ী আমি হুগোকে রাজতন্ত্রের সমর্থক বানাই নি। লাফার্গের ব্যাখ্যা অভ্রান্ত এমন কথাও আমি বলিনি। রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ শুধু উগ্র বামপন্থীরাই করেন নি, তাঁদের সঙ্গে সনাতনী রক্ষণশীলেরাও রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ করেছিলেন এ কথাও মনে রাখা দরকার। রাগটা শুধু বামপন্থীদের উপর ঝাড়লে চলবে কেন ?

এঙ্গেল্‌স্‌-এর চিঠিগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, লাফার্গ কখনও বামপন্থী বিচ্যুতি, কখনও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির কবলে পড়েছেন। হুগোর ক্ষেত্রে তাঁর বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে চট্‌ করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে না। কারণ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে কারুর মতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় না। বার্নার্ড শ ও তলস্তয় শেক্সপীয়রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন বলে আমরা তাঁদের উগ্র বামপন্থী আখ্যা দেব ?

তৃতীয়ত, লাফার্গ হুগোর সমকালীন লোক। হুগোকে গর্কী বা অন্যেরা যে ভাবে গ্রহণ করেছেন লাফার্গ সে ভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন নি। হয়তো সমকালীনতাই এর কারণ। হুগোর গণতন্ত্রপ্রীতিতে লাফার্গ ও তাঁর মতো বামপন্থীরা বুর্জোয়াপ্রীতি ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি। তিনি হুগোর শোক-মিছিলে সমাজতন্ত্রীদের যোগদান সম্পর্কে লিখেছেন :

"All the socialists and revolutionary organisations have decided to take no part in the funeral procession of this greatest of charlatans, this reactionary humbug." (পত্র নং ১৫৫, এঙ্গেলস পল ও লরা লাফার্গ পত্রাবলী)

এ রকম তীব্র মন্তব্যের কারণ শুধুই উগ্র বামপন্থী মনোভাব নাও হতে পারে। আমি নিজে হুগোর ভক্ত পাঠক, লেখক হিসাবে হুগো সম্পর্কে লাফার্গের মন্তব্য আমার পক্ষে হজম করা কঠিন, তবে রাজনীতির বিচারে হুগোর গণতন্ত্রপ্রীতি একটু ঠুনকো ছিল বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে এক সময় জন স্ট্র্যাচি বার্নার্ড শ সম্পর্কে তাঁর 'কামিং স্ট্রাগল ফর পাওয়ার' নামক গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছিলেন

তা মনে পড়ছে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, বার্নার্ড শ ইংরেজদের মধ্যে (আইরিশম্যান হলেও) কমিউনিজমকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু প্রতিপত্তি ও স্বচ্ছন্দ জীবনের মোহ কাটিয়ে না উঠতে পেরে তিনি কমিউনিস্ট হন নি। সম্ভবত লাফার্গও একই কারণে হুগোর প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন।

সুকুমার মিত্র

চারুলতা প্রসঙ্গে

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'চারুলতা'র আলোচনা পড়ে কিছু প্রশ্ন জেগেছে যার নিরসন চাই।

মহৎ-সাহিত্যভিত্তিক চিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল সুর, স্বাদ ও রসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে কেউ বলেছেন—চারুর গোপন শোকের অনাবৃত আত্মস্বরূপটি দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে এবং তাতে অন্তর্‌প্রবাহী রসবিন্যাসের বিচ্যুতি হয়নি। কেউ বলেছেন সারাংশ বিধৃত হয়েছে। কেউ বলেছেন ছন্দোবদ্ধ রচনায় সুর যোজনা করে যে-গান তা নতুন সৃষ্টি, তার বিচার কাব্যগুণ দিয়ে নয়, সুর দিয়ে।

মানুষের সত্তা, আত্মস্বরূপ তো অখণ্ড নয়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পারিপার্শ্বিকের টানা-পোড়েনে এক মানুষের অসংখ্য সত্তা, অসংখ্য রূপ। মূল সুর বা সারাংশকে বিধৃত করতে হলে প্রবলতর রূপটিকেই ধরতে হবে।

চারুর রূঢ়তা, কামনা, অসংযম কাহিনীর মূল সুর ? ভূপতির নিয়মতান্ত্রিকতা, অমানবিকতা মূল সুর ? না চারু-ভূপতির হৃদয়ে মস্তিষ্কে, ন্যায়-অন্যায়ে, ভালো-মন্দর টানা-পোড়েনে বিক্ষত হওয়ার গান মূল সুর ? পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বিশ্বস্ততায় টান পড়া আর সুপরিকল্পিত বিশ্বাসঘাতিনী হওয়ার স্বাদ এক ? বিষাদময় কাব্যে বসন্ত-বাহার-হোরি সুরারোপ গ্রহণযোগ্য ?

চা দিতে বলায় চারুর সর্বপ্রথম যে কথা শোনা গেল তার স্বর, তার ভঙ্গি, তার সংলাপ পীড়াদায়ক ভাবে রূঢ়। প্রথম যে-চারু আদর্শনিমগ্ন ভূপতিকে দেখল তার দৃষ্টি বেদনাদায়করূপে তীব্র। 'স্বর্ণলতা' প্রসঙ্গে "হাসছ কেন"র স্বর ও ভঙ্গি, সাহিত্যচর্চায়, ভূপতির নির্দেশের উল্লেখে আচরণ, অমলকে 'বিশ্ববন্ধু' দিয়ে আঘাত, অমলের বুকের উপরে কান্না, ভূপতির অমঙ্গল-আশঙ্কাক্ষণে অমলের হাত ধরে টানাটানি, বিশ্বাসঘাতিনী প্রমাণিত হওয়ার পরও নির্দ্বিধায় ভূপতির মুখোমুখি হয়ে অকম্পিত স্বরে তাকে আহ্বান সব মিলিয়ে এক জঘন্য রূঢ়, আত্মকেন্দ্রিক, ঈর্ষাপরায়ণ, অসংযমী নারী সৃষ্টি হয়েছে—তাতে চারু নেই।

এ চারুকে ভালোবাসা যায় না, এ চারুর জন্য সমবেদনা হয় না। সহানুভূতি আর ঘৃণার রং এক ?

চারুর অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রনায় ব্যথা বোধ করে ভূপতির মানবিক আচরণ চিত্রে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে এক নিয়মতান্ত্রিক, হৃদয়হীন ভূপতি সৃষ্টি হয়েছে। পত্রান্তরে ভূপতিকে প্রভু-মনোভাব ও আত্মম্ভরিতায় মণ্ডিত করা হয়েছে। ষাট বছর আগে যে দু'টি চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গির গুণে সমবেদনা আদায় করেছে ষাট বছর অগ্রগতির পরে সে চরিত্রবিন্যাসে যদি বিরাগ সৃষ্টি হয় তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিক্রিয়াশীল বলে সন্দেহ জাগে, প্রশ্ন জাগে 'মহানগর'-এর শেষার্ধের ব্যর্থতার কারণ কি ?

শেষ দৃশ্যের শিলীভূত রূপের সমর্থনে একাধিক পত্র-পত্রিকা 'নিষ্প্রাণ' শব্দটি প্রয়োগ করে তারিফ করেছেন। 'নষ্টনীড়' কি একটি শিলীভূত, মিউজিয়ামে রাখা বাড়ির ছবি? সে নীড়ের রক্তাক্ত-হৃদয় পাখিদের হারানো সুরের করুণ রেশ কোথায় ?

চারুর নিঃসঙ্গতা প্রকাশের অধ্যায়টিকে নিয়ে বহু মাতামাতি হয়েছে। বস্তুত ঐ অংশের অভিনয় অতি দুর্বল। নিঃসঙ্গতা-প্রকাশক কতকগুলি এ্যাকশান বিধিবদ্ধ করে যান্ত্রিক ভাবে পালিত হয়েছে। ঐ অংশের ছবির মন্থরতার জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়েছে—ছবির মন্থরতা দর্শকের সত্তার সঙ্গে মিশে যায়নি তার কারণ যান্ত্রিক অভিনয়—তারও গোড়ার কারণ চারুলতার রূপান্তর। প্রকাশ যা পেয়েছে তা ধনী-গৃহিণীর খামখেয়ালীপনা। দুরবীণটির ব্যবহারেও (অথবা বহুল ব্যবহারে) ধনী গৃহিণীর হাতের খেলনার বেশি আর কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গে অমলের আবির্ভাব বা খাঁচার পাখির ইঙ্গিতে কি নতুন সৃষ্টির কৃতিত্ব আছে? আমাদের কি নতুনতর কিছু দাবি করার নেই ?

একাধিক আলোচনায় অমলের দেওয়া দোলায় চারুর ভুবনদোলার ইঙ্গিত আরোপিত হয়েছে। অথচ কথাটা সঠিক মনে হয় না—না ভাবার্থে, না আক্ষরিক অর্থে। অমল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চারুকে কোনো দোলাই দেয় নি। না হৃদয়ে, না মস্তিষ্কে। পরের দোলাগুলি নিজেই দিয়ে নিতে পারবে ব্যক্ত করার পর আর মাটিতে পা ছুঁয়ে যাওয়ার উপরে দোদুল্যমান সংসারে শক্ত মাটিতে দাঁড়াবার প্রয়াসের ইঙ্গিত প্রযোজ্য কি ?

প্রচণ্ড দোল খাওয়া অবস্থায় অকম্পিত অ-ভগ্ন স্বরে গান কি সম্ভব ?

গাড়িতে (শেষ বারে) ভূপতির চলমানতার সঙ্গে, তার মুখের উপরের আলোর ব্যতিক্রমে [illegible] ছিল না মনে হয়।

অমলের স্যুটকেসটি কালোপযোগী ?

শ্রীরায় আমাদের জয়ের পতাকা এনে দিয়েছেন। চিত্র-সমালোচকরা সে পতাকার প্রহরায় অতন্দ্র আছেন তো!

মিন্টু রায়